শ্রীমান নলিনীভূষণ গুহ

সোদর-প্রতিমেষু।

নিবেদন।

আমার প্রিয়বন্ধু সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় আমাকে হাস্যাস্পদ না করিয়া ছাড়িবেন না। বন্ধুর আবদার,—তাই নৈবেদ্যের আয়োজন! যাহার অধিক সামর্থ্য নাই, সে আর কিছু না পারুক পুষ্পচন্দনের আয়োজন করিতে পারে।

গল্প কয়েকটী বিবিধ মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল; তবে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার সময়ে তাহাদের আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

কলিকাতা, } শ্রীজলধর সেন।

দ্বিতীয় সংস্করণের কথা।

অনেক দিন পরে 'নৈবেদ্যের' দ্বিতীয় সংস্করণ হইল। যাহা কোন দিন আশা করি নাই, তাহা হইয়াছে; ইহাতেই আমি কৃতার্থ।

আমার 'নৈবেদ্যের' উপকরণ মোটা আতব চাউল আর কাঁচা কলা; তাহা রূপার থালে সাজাইলে মানাইবে কেন? তাই প্রথম সংস্করণের পুস্তকের সৌষ্ঠবসাধনের কোন চেষ্টা করি নাই। এখন দ্বিতীয় সংস্করণ হইতেছে দেখিয়া বুঝিয়াছি আমার 'নৈবেদ্য' গৃহীত হইয়াছে, তাই এই সংস্করণটা একটু গুছাইয়া দিলাম, কাগজ, ছাপা একটু ভাল করিলাম; আর যেখানে যাহা ত্রুটি ছিল, তাহা সংশোধন করিয়া দিলাম; নূতন আর কিছু সংযোজন করিলাম না।

কলিকাতা, শ্রাবণ ১৩২১। শ্রীজলধর সেন।

সূচীপত্র

—*—

নৈবেদ্য

অন্ধের কাহিনী।

আমি অন্ধ। জন্মান্ধ নহি,—আজ এক বৎসর মাত্র অন্ধ হইয়াছি; তাই চক্ষু না থাকার কি দুঃখ তাহা বুঝিতেছি। এই একটি বৎসর আমার নিকট শতবর্ষের ন্যায় দীর্ঘ বলিয়া মনে হইতেছে। স্মৃতি আজও পুরাতন হয় নাই; অন্ধের স্মৃতি সমধিক তীক্ষ্ণ, তাই এখনও সেই অতীত চক্ষুষ্মান্ জীবনের কথা মনে পড়িতেছে;—সেই বিচিত্র-সৌন্দর্য্যপূর্ণা, শ্যামলা ধরিত্রী, রক্তিম-রাগ-রঞ্জিত ঊষার বিমল-বিভা, চন্দ্রমাশালিনী শারদ-যামিনীর স্নিগ্ধ শোভা, এবং সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সম্পদ নরনারীর প্রফুল্ল মুখ,—বিশ্বের সকল সামগ্রীর উপর বিধাতা আজ এক বৎসর পূর্ব্বে যে যবনিকা প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন, এ জীবনে তাহা আর উত্তোলিত হইবে না। অন্ধকার, চারিদিকে নিশীথের ঘন অন্ধকার পরিব্যাপ্ত! চক্ষুহীনের কি কষ্ট তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু কেন এমন হইল, তাহা যাহাদের চক্ষু হারাইয়া জীবন ব্যর্থ হয় নাই, তাহাদের কি শুনিবার অবসর হইবে? শুনিলে তোমরা বুঝিতে পারিবে, আমার মত হতভাগ্য পৃথিবীতে অধিক নাই।

আমি পল্লীগ্রামের গৃহস্থের সন্তান। পিতা সম্পন্ন অবস্থার লোক ছিলেন না; তাই ভাল লেখা পড়া শিখিতে পারি নাই। ভদ্র কায়স্থ ঘরের মূর্খের

অনন্ত বিপদ ; ভদ্রলোকের উপযোগী কোন জীবিকা অবলম্বন করিবার ক্ষমতা নাই, কোন নীচ কাজ করাও বিশেষ অগৌরবের। পিতা সামান্য তহশিলদারী করিতেন ; মা আমার লক্ষ্মী ছিলেন। তাঁহার গুণে পিতার সামান্য উপার্জ্জনেও আমরা কোন দিন অন্নকষ্ট সহ্য করি নাই। পল্লীগ্রামের পিতার কুপোষ্য, নিষ্কর্ম্মা, আড্ডাপ্রিয় লোকের মত আমিও নির্ভাবনায় আড্ডায় আড্ডায় ঘুরিয়া বেড়াইতাম ; বৃদ্ধ পিতা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতেন। স্নেহাধিক্য বশতঃ তিনি আমাকে কোন দিন তাঁহার দুঃখ-কষ্টের কথা বলেন নাই—ঘরে আমি যে একমাত্র সন্তান।

হতভাগ্যের সুখ বুঝি বিধাতার সহ্য হয় না। একটি স্নেহমুগ্ধ, নির্ব্বোধ বালকের অজ্ঞতা-জনিত সুখও তাঁহার সহ্য হইল না। বিধাতারই বা দোষ দিই কেন ? নিজের অদৃষ্টের বিড়ম্বনা। ষোল বৎসর যখন বয়স তখন ওলাউঠারোগে মাতৃদেবী আমাদের ছাড়িয়া গেলেন। কষ্ট কি, সেই দিন প্রথম জানিতে পারিলাম। সেই কষ্টের আরম্ভ—তাহার পর নদী-তরঙ্গের মত কষ্টের উপর কষ্টের প্রবাহ আসিতেছে ; শুষ্ক, জীর্ণ, লঘু তৃণের মত আমি ভাসিয়া চলিতেছি। জানি না এ কষ্টের, এ নিদারুণ দুঃখ-দারিদ্র্যের অবসান কোথায় ?

বলিয়াছি বাবার বয়স হইয়াছিল। এ দুর্ভাগ্য বাঙ্গালা দেশে তাঁহার মত পক্বকেশ, জরাজীর্ণ বৃদ্ধের হস্তে কন্যা-সম্প্রদান করিবার আগ্রহ রাখে, এমন কায়স্থ-সন্তানের অভাব নাই। আমার মাতৃবিয়োগে বাবা বড় কাতর হইয়াছিলেন ; তাঁহার সংসারে বিরাগ জন্মিয়াছিল ; তাই শুভানুধ্যায়ী বন্ধুগণের পরামর্শসত্ত্বেও একটি বালিকার ইহপরকাল নষ্ট করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না ; কিন্তু ঘরে একটিও স্ত্রীলোক না থাকায় সংসার প্রায় অচল হইয়া উঠিল ; সুতরাং গৃহ সচল করিবার উদ্দেশ্যে তিনি এক

একাদশবর্ষীয়া পুত্রবধূ অবিলম্বে গৃহে আনিলেন; তখন আমি সপ্তদশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছি।

মানুষ এক ভাবিয়া কাজ করে, অনেক সময় তাহার ফল হয় বিপরীত। বিবাহের ছয় মাস পরে আমার পিতার কাল হইল। গৃহে আমরা স্বামী-স্ত্রী, কিন্তু একটি কপর্দ্দকও সম্বল নাই। গ্রামস্থ পাঁচজন সহৃদয় লোকের সাহায্যে কোন প্রকারে পিতৃদায় হইতে উদ্ধার হইলাম। তাহার পর কি খাইয়া দিন কাটাইব, তাহার উপায় দেখিলাম না। ইহার উপর আর এক বিপদ উপস্থিত। বাবা যে জমীদারের চাকরী করিতেন, তাঁহার হৃদয় নামক পদার্থটা ছিল না। বাবা প্রাণপণে প্রভুর সেবা করিয়া গিয়াছেন; তাহার প্রত্যুপকার স্বরূপ ভৃত্যবৎসল মনিব হিসাব-নিকাশ করিয়া অনেক টাকার জন্য বাবাকে দায়ী করিলেন। বাবা তখন স্বর্গে; দেনার দায় আমার ঘাড়েই পড়িল। সম্পত্তির মধ্যে একখানি খোড়ো বাড়ী; জমীদারের দৃষ্টি-পাতমাত্র দেখিতে দেখিতে সেই স্থাবর সম্পত্তিটুকু উড়িয়া গেল। এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে আমাদের স্বামী স্ত্রীর পরিধেয় বস্ত্র ব্যতীত, শোক-কাতর, দারিদ্র্য-কষাহত অবসন্ন দুইটী দেহ ভিন্ন, স্থাবরাস্থাবর আর কিছুই বর্ত্তমান রহিল না। অষ্টাদশ বৎসর বয়সে, প্রথম যৌবনে,—যখন পৃথিবী স্বর্গ বলিয়া মনে হয়,—যখন মানুষ উত্তপ্ত শোণিতের উন্মত্ততায় মনে করে এ বিপুল জগতে সুখ অনন্ত, আশা অনন্ত;—অনন্ত জীবন অনন্ত তৃপ্তির জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে,—সেই বিকাশোন্মুখ যৌবনে, দ্বাদশবর্ষীয়া পত্নী লইয়া, আমি সংসারসাগরে ভাসিলাম।

আপাততঃ শ্বশুরালয়েই আশ্রয় লইলাম। আমার মত অক্ষম যুবককে যিনি কন্যাদানে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাঁহার আর্থিক অবস্থা যে শোচনীয় তাহা বলাই বাহুল্য; আমাদের স্বামী স্ত্রীকে দীর্ঘকাল প্রতিপালন করিবার

সাধ্য তাঁহার ছিল না। তাঁহার কোন আত্মীয় কলিকাতার একটি ছাপাখানার অধ্যক্ষ ছিলেন; শ্বশুর মহাশয় আমার জন্য তাঁহাকে ধরিলেন। ছাপাখানার কর্ত্তামহাশয় দয়াপরবশ হইয়া আমাকে কলিকাতায় লইয়া চলিলেন, আমার স্ত্রী তাঁহার পিত্রালয়েই রহিলেন।

আমার মত বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন যুবককে ছাপাখানার ম্যানেজার যে কর্ম্ম দিতে পারেন, অনুগ্রহ করিয়া তিনি আমাকে তাহাই যোগাড় করিয়া দিলেন। একটি ছাপাখানায় কিছুকাল শিক্ষানবিশী করিয়া আমি ছাপাখানার ভূত্তের দলে প্রবেশ করিলাম। সংসার-সাগরে ভাসিতে ভাসিতে যে তৃণ পাইলাম, তাহাই অবলম্বন করিলাম। কিছুদিন পরে মাসিক পনর টাকা বেতনে সরকারী ছাপাখানায় এক কম্পোজিটারের কাজ জুটিয়া গেল।

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে পাশের মূল্য পনর টাকায় নামে নাই। আমার বাবা চিরদিন সাতটাকা বেতনে তহশিলদারী কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছেন, আমি অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার ডবল মূল্যের চাকরী পাইয়া নিজের অদৃষ্টকে ধন্যবাদ করিলাম। কখন কখন অতিরিক্ত দুই চারি ঘণ্টা খাটিতে হইত, কিন্তু সে জন্য আক্ষেপ ছিল না; দুই পয়সা অতিরিক্ত আয়ের সম্ভাবনা দেখিলে মানুষ সকল রকম কষ্টই সহ্য করিতে পারে; আমিও সংসার-সুখের আশায় মুগ্ধ হইয়া পরিশ্রমে কোন দিন পশ্চাৎপদ হই নাই।

স্ত্রীকে আর কতদিন বাপের বাড়ী ফেলিয়া রাখিব? ভাবিলাম কষ্টেস্বৃষ্টে এই সামান্য আয়েই আমাদের দুজনের চলিয়া যাইবে। সুলোচনাকে কলিকাতায় আনিলাম। কলিকাতার তালতলায় একখানি ছোট খোলার বাড়ী ভাড়া লইয়া তাহাতেই দুজনে বাস করিতে লাগিলাম। অর্থকষ্টের

অভাব ছিল না, কিন্তু সে জন্য আমাদের মনের সুখ নষ্ট হয় নাই,—চির অভাবের মধ্যেই ত আমরা প্রতিপালিত। পরমেশ্বর যতটুকু সুখ দিয়াছেন, তাহারই জন্য তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া ধন্যবাদ করিলাম; তখন মনে মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তিনি দয়াময়!

কিছুদিন পরে—কতদিন পরে ঠিক মনে নাই, আমার স্ত্রীর কলিকাতা আসিবার কয়েক বৎসর পরে বটে,—একদিন জ্যৈষ্ঠ মাসে আমার কোন সহযোগী কম্পোজিটারের ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে আমরা সপরিবারে নিমন্ত্রিত হইলাম। এই কম্পোজিটারটি আমার মুরব্বি মহাশয়েরই আত্মীয় এবং আমার পরম বন্ধু। তিনি বিশেষ জেদ করিয়া বলিলেন, আমার স্ত্রীকে যাইতেই হইবে, তিনি কিছুতেই ছাড়িবেন না।

বন্ধুর অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিলাম না, সুলোচনাকে তাঁহার অনুরোধ জ্ঞাপন করিলাম। বাঙ্গালার স্ত্রীলোক সর্ব্বত্র এক ছাঁচে ঢালা। তিনি প্রথমে অসম্মতি জানাইয়া বিস্তর পীড়াপীড়ির পর বলিলেন, "আমার লজ্জা করে; এমন খালি গায়ে কি মানুষের বাড়ী যাওয়া যায়? লোকে কি বলবে?" আমি বলিলাম, "লোকে বলবে ইহারা বড় গরীব, একখানা গহনাও নাই। তাহাতে ক্ষতি কি?" সুলোচনা কিছুতেই যাইবেন না। রমণীর অবাধ্যতা যখন প্রবল হয়, তখন পুরুষের কোন যুক্তি ফলপ্রদ হয় না। অগত্যা আমার হিতৈষী বন্ধু মহাশয়ের নিকট হইতে একজোড়া বালা, একজোড়া তাগা, আর একছড়া হার আনিয়া দিলাম। আমার স্ত্রী নিমন্ত্রণ রাখিতে গেলেন; ঘণ্টা কতক সেখানে কাটাইয়া সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই তিনি বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম আমার স্ত্রী পাগলিনীর ন্যায় কাঁদিতেছেন; না জানি কি অনর্থপাত হইয়াছে ভাবিয়া আমার বুকের

ভিতর কাঁপিয়া উঠিল। তিনি আমাকে দেখিয়া অধিক বেগে কাঁদিয়া উঠিলেন, তাহার পর আমার পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া বলিলেন,—"সর্ব্বনাশ হয়েছে গো, পরের তাগা হারিয়ে বসে আছি! এখন আমাদের কি উপায় হবে!" ছাতাটি হাতে করিয়াই আমি শানের উপর বসিয়া পড়িলাম। পৃথিবী আমার চক্ষের উপর ঘুরিতে লাগিল; চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলাম। পনর টাকা বেতনের কম্পোজিটার আমি, বসু মহাশয়ের দুইশত টাকা মূল্যের তাগা আমি কি রকম করিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া দিব! জগৎ শূন্যময় বোধ হইল।

অনেকক্ষণ ভাবিয়া যখন কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, তখন অগত্যা নিরাশার সান্ত্বনায় বুক বাঁধিতে হইল। কিরূপে তাগা হারাইল, তাহার কারণানুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, আমার স্ত্রীর হাতে তাগা দুগাছা ঢলঢল করায় তিনি তাহা খুলিয়া বালিশের নীচে রাখিয়া কলে হাত মুখ ধুইতে গিয়াছিলেন; সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া অন্য কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন; তাগার কথা মনে ছিল না। হঠাৎ তাগার কথা মনে পড়ায়, তিনি তাগা জোড়াটা আঁচলে বাঁধিয়া রান্না করিতে যাইবেন ভাবিলেন এবং বালিশের নীচে হইতে তাহা আনিতে গেলেন। দরজা খোলা ছিল, বালিশ তুলিয়াই দেখেন তাগা নাই! ঘরের সর্ব্বস্থান অনুসন্ধান করিয়াও আর তাহা মিলিল না। হৃদয়ের আগ্রহে যদি খোয়া জিনিস পাওয়া যাইত, তাহা হইলে পুত্রহারা জননীর রোদন ব্যর্থ হইত না!

একটা চিন্তা আমার সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টকর হইয়াছিল। বসু মহাশয়কে যদি বলি তাগা জোড়াটা হারাইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে তিনি কি বিশ্বাস করিবেন? আমি গরীব; তাঁহার এবং তাঁহার স্ত্রীর যদি মনে হয় আমি তাগা বিক্রয় করিয়া খাইয়াছি, তবে আমি কেমন করিয়া তাঁহাকে বিশ্বাস করাইব

যে, সত্যই তাগা হারাইয়া গিয়াছে। পুলিস আসিয়া বাড়ী খানাতল্লাসী করিলে অপমানের সীমা থাকিবে না। আমি গরীব, ন্যূনাধিক দুইশত টাকা ভাঙ্গিয়া সোণার তাগা গড়াইয়া বসু মহাশয়কে দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব; কিন্তু আর উপায় নাই। আমার সুনাম ও কর্ত্তব্য একদিকে, অন্যদিকে আমার জীবন। জীবন পণ করিয়া আমি আমার সুনাম ও কর্ত্তব্য বজায় রাখিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলাম। আমার স্ত্রীকে বলিলাম, তুমি এই তাগা হারাণ সম্বন্ধে কাহারও নিকট কোন কথা বলিও না।

তাহা ত হইল—কিন্তু পরদিন প্রভাতে অলঙ্কার কোথায় পাইব? দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রভাত হইল; আমি ভাবনার সমুদ্রে ডুবিয়া রহিলাম। আমার স্ত্রী অপরাধিনীর মত এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। বেলা হইলে সেভিংস ব্যাঙ্কের খাতা খানি বাহির করিলাম; দেখিলাম তাহাতে বিয়াল্লিশ টাকা ছয় আনা মজুত। কখন কখন দুই এক টাকা বাঁচাইয়া ডাকঘরে সুদে আসলে এই টাকা সঞ্চিত ছিল। এ টাকা দু ভরি সোণার পক্ষেও যথেষ্ট নহে; আমাকে আর একটি দিনের মধ্যেই আট ভরি ওজনের তাগা দিতে হইবে। পরের গহনা দু দিনের বেশী কি বলিয়া ঘরে রাখিব?

অপরাহ্লে গৃহের বাহির হইয়া পড়িলাম। তালতলায় এক স্বর্ণকারের জুয়েলারি ফারম্ ছিল; তাহার দোকানে গিয়া তাহাদের তৈয়ারী স্বর্ণালঙ্কার গুলি দেখিতে চাহিলাম। তাহারা যে কয়েক জোড়া তাগা বাহির করিল, তাহার মধ্যে এক জোড়া ঠিক সেই হারাণ তাগার মত;—তত বড়, সেই রকম কাজ করা, ওজনেও সেই রকম বলিয়া বোধ হইল। মূল্য জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, একশত আশি টাকা তাহার দাম। আমিও এই

রকমই মনে করিয়াছিলাম। পরদিন আসিব বলিয়া দোকান পরিত্যাগ করিলাম।

কিন্তু টাকা কোথায়! দেড় শত টাকার আবশ্যক ; আমার মত সামান্য কম্পোজিটারকে কলিকাতা সহরের কোন লোক দেড় শত টাকা ধার দিতে পারে, এ কথা সম্ভব বলিয়া মনে হইল না! লোকেরও সেজন্য অপরাধ দেওয়া যায় না। আমার কি দেখিয়া তাহারা টাকা দিবে? কয়েকজন কম্পোজিটার বন্ধুর নিকট চেষ্টা করিলাম; তাহাদের অধিকাংশের অবস্থাই আমার মত। শেষে জানিতে পারিলাম আমাদের প্রেসের যিনি বড় বাবু তিনি মহাজনী করেন; স্থির করিলাম তাঁহার কাছেই ধার লইব। কিন্তু এত টাকা ধার লইবার কি কারণ দেখাইব? সত্য কথা বলা যায় না, মিথ্যাই বলিতে হইবে; শ্বশুরের কোন আসন্ন বিপদের কথা জানাইয়া টাকা লইব। পাঠক, আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া ঘৃণা করিতেছেন, কিন্তু কি করিব, সত্য মিথ্যা তখন আমার জ্ঞান ছিল না। আমার তখন একমাত্র কথা মনে জাগিতেছিল—তাগা পরদিনই ফেরত দিতে হইবে! নহিলে মান ইজ্জত সবই নষ্ট হয়!

রাত্রে আর বড়বাবুর কাছে গেলাম না, বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখি আমার স্ত্রী সেই এক স্থানেই বসিয়া রহিয়াছেন। এই দুদিনে বেচারার শরীরের অর্দ্ধেক রক্ত শুকাইয়া গিয়াছে। আমার নিজের মানসিক কষ্টের উপর তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। আমি তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিলাম, তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া, আমি যাহা মতলব করিয়াছিলাম, তাহা সকলই খুলিয়া বলিলাম। তিনি বলিলেন, "এ টাকা শোধ হইবে কি করিয়া?"

আমি বলিলাম, "সুলোচনা, কিছু চিন্তা করিও না; যদি আমার

চক্ষু দুটি বজায় থাকে ত আমি সংবৎসরের মধ্যে এ ঋণ পরিশোধ করিব। তোমার মুখের দিকে চাহিয়া আমি দ্বিগুণ পরিশ্রম করিব; তোমার মুখ যদি প্রফুল্ল দেখিতে পাই তাহা হইলে আমি পরিশ্রমকে পরিশ্রম বলিয়া মনে করিব না। তুমি আর অধীরা হইও না।"

সুলোচনা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বুঝিয়াছি; মান বাঁচাইবার জন্য নিজের সুখ, নিজের শরীর, সমস্ত নষ্ট করিবে স্থির করিয়াছ। আমিই তোমার সর্ব্বনাশ করিলাম।" তাঁহার কথার প্রতিবর্ণে নিরাশার ও কাতরতার ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল।

পরদিন প্রাতঃকালে বড় বাবুর কাছে তমস্থক লিখিয়া দিয়া একশত চল্লিশ টাকা কর্জ্জ লইলাম। বড় বাবুর সুদ কিছু বেশী, কম্পোজিটারগণ অনেক সময় তাঁহাকে "ঘাগু" বলিত। হউক, আমি তাঁহার নিন্দা করিব না, অসময়ে তিনি আমার বড় উপকার করিলেন। মাসে শতকরা দুই টাকা সুদের করারেই টাকা লইলাম। তমস্থকের গোড়াতেই কিস্তিবন্দী ছিল, প্রতি মাসে পনর টাকা করিয়া শোধ করিতে হইবে। নিজের অবস্থার কথা না ভাবিয়া, কোন কথা চিন্তা না করিয়া বড় বাবু যে সর্ত্ত করিলেন, তাহাতেই রাজি হইলাম। কোন কিছু ভাবিবার অবকাশ ছিল না—গহনা যে আজ ফেরত দিতে হইবে।

আফিস হইতে সকাল সকাল ফিরিয়া তাগা জোড়াটা ক্রয় করিলাম; তাহার পর সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাবু মহাশয়ের বাড়ী গিয়া বালা, তাগা আর হার ফেরত দিলাম। কার্য্যবশে অলঙ্কার ফেরত দিতে দুদিন বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। বসু মহাশয় উদার ও সরল হাস্যে বলিলেন, "সেজন্য অত সঙ্কুচিত হইতেছে কেন? এ বিলম্বের জন্য ত আমার কোন ক্ষতি হয় নাই।" তিনি অলঙ্কারগুলির

দিকে না চাহিয়াই তাহা অন্তঃপুরে গৃহিণীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। আমি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম!

এইবার ঋণের ভাবনা আমাকে গ্রাস করিয়া বসিল। কি করিয়া কিস্তিবন্দি মাফিক মাসিক পনর টাকার সুদ যথানিয়মে বড় বাবুকে দিব? মাসে উপার্জ্জন পনর টাকা, 'একষ্ট্রা' কাজে কোন মাসে দুই চারি টাকা হয়। দীর্ঘকাল আবার কথনও তাও হয় না। স্বামী স্ত্রীতে অনাহারে থাকিয়া ঋণ শোধ করা সম্ভবপর নহে। সুলোচনাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া যে ব্যয়-সংক্ষেপ করিব, সে সম্ভাবনাও নাই; শ্বশুর মহাশয়ের অবস্থা এদিকে অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। অনাহারে মৃত্যুই যদি অনিবার্য্য হয়, কলিকাতায় একত্র থাকিয়া দুজনে মরিব।

সুলোচনা আমার সঙ্গে থাকিয়া দুঃখ ভোগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, বলিলেন, "আমার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যই তোমার এত জ্বালা, আর এ দুর্দ্দিনে তোমাকে বিপদে ফেলিয়া কোন্ মুখে বাপের বাড়ী গিয়া বসিয়া থাকিব? দুঃখ সহিতে পারিব না ত হিন্দুর মেয়ে হইয়া জন্মিয়াছিলাম কেন?" মুহূর্ত্তের জন্য মনে হইল জগতের মধ্যে আমি সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখী নহি, আমার সহিত অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে চায়, খুঁজিলে পৃথিবীতে এমন লোকও মেলে। প্রিয়তমা পত্নীর সেই স্বর্গীয় প্রণয়কে হৃদয়ের অক্ষয় কবচস্বরূপ গ্রহণ করিয়া, ভগবানের করুণায় নির্ভর করিয়া, আমার ত্রিশ বৎসরের যৌবনের সকল শক্তি, সকল দক্ষতা, সকল চিন্তা, ঋণ-শোধ-রূপ কঠোর ব্রত সাধনার অঙ্গ বিবেচনা করিয়া, অতি দুষ্কর কর্ম্ম সাধনে রত হইলাম। যাহা করিলাম তাহার অধিক কেহ পারে, একথা আমি বিশ্বাস করি না;—সকলে যে ততখানি পারে না, একথা নিশ্চিত।

যে খোলার বাড়ীখানাতে এতদিন সপরিবারে বাস করিতেছিলাম, তাহার ভাড়া কিছু বেশী ছিল ; তাহা ত্যাগ করিয়া আর একটি খোলার বাড়ীর একখানা ঘর মাসিক পাঁচ সিকায় ভাড়া লইলাম। একবেলা আহার ত্যাগ করিলাম। সমস্তদিন পরে সন্ধ্যার সময় দুটি মোটা চাউলের ভাত কোন দিন বেগুণ-পোড়া দিয়া, কোন দিন আধ পয়সার চিংড়িমাছ দিয়া উদরস্থ করিতাম ; তাহার পর অর্দ্ধ-পূর্ণ উদরে বহুবাজারের 'বাসন্তী প্রেসে' ঠিকা কাজ করিতে যাইতাম। সেখানে প্রত্যহ পাঁচ ঘণ্টা কাজ করিয়া রাত্রি বারটার সময় বাসায় ফিরিতাম।

অতি দুঃখের দিনও কাহারও পড়িয়া থাকে না ; আমার দিনও পড়িয়া রহিল না। কিন্তু বড় কষ্টে দিন কাটিতে লাগিল। আমার শরীর দিন দিন অবসন্ন হইয়া পড়িল ; তথাপি আমার লক্ষ্যপথ হইতে আমি বিচলিত হইলাম না। ছয় মাস পরে আমার মাথার অসুখ হইল ; মধ্যে মধ্যে মাথা ঘুরিয়া উঠে, শরীর এত দুর্ব্বল যে, নিজের শরীর টানিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত ক্রমে কমিয়া আসিতে লাগিল। উপযুক্ত আহার নাই, চক্ষে ঘুম নাই, মনে শান্তি নাই, দুঃখময়, কষ্টময়, অসহনীয় জীবন প্রতিদিন অবিরাম পরিশ্রমে পাত করিতে লাগিলাম। জীবনের ভার এবং কর্ত্তব্যের কঠোরতা কি দুর্ব্বহ !

এমনই করিয়া আট মাস কাটিয়া গেল। পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ, এ আট মাসের শেষে বড় বাবুর দেনা শোধ করিয়া তমসুক ফিরাইয়া লইয়া বাসায় আসিলাম। নিঃশেষিত-তৈল নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখা নৈশবায়ুর তাড়নায় যেমন প্রতি মুহূর্ত্তেই অন্ধকারে বিলীন হইবার উপক্রম করে, আমার নিঃশেষিত-শক্তি জীবনও সেইরূপ মৃত্যুর চির অন্ধকারে অচিরে আচ্ছন্ন হইবে বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম। দেনা শোধ করিয়া

মনের ভার কমিয়া গেল বটে, কিন্তু দেহের ভার দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল; উৎসাহে এতদিন অমানুষী পরিশ্রম করিয়াছি, সে উৎসাহ আজ শেষ হইয়াছে, গৃহে আসিয়া সন্ধ্যাকালে শ্রান্ত দেহে শয্যা গ্রহণ করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে আর বিছানা হইতে উঠিতে পারি না; বোধ হইল দেহের সমস্ত রক্ত জল হইয়া গিয়াছে। অনেক কষ্টে শয্যাত্যাগ করিলাম; চক্ষে অসহ্য বেদনা বোধ হইতে লাগিল। আমার স্ত্রী বলিলেন, দুটি চক্ষুই 'করম্‌চার' মত লাল হইয়াছে। যতই বেলা বাড়িতে লাগিল, ততই যন্ত্রণার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রেসে যাইতে পারিলাম না। অতি কষ্টে, অনিদ্রায় সে রাত্রিও অতিবাহিত করিলাম।

রাত্রি প্রভাত হইলে মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে চক্ষু দেখাইবার জন্য উপস্থিত হইলাম। বন্ধু মহাশয়ের এক ছেলে সেখানকার ডাক্তার। তিনি আমাকে তাঁহাদের সাহেবের কাছে লইয়া গেলেন। সাহেব যন্ত্রাদির সাহায্যে চক্ষু পরীক্ষা করিয়া আমাকে যে কথা বলিলেন তাহা মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত আমার মনে থাকিবে; তিনি বলিলেন, আমার দুটি চোখই গিয়াছে, চিকিৎসার আর সময় নাই।

দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হইবার পূর্ব্বেই আমি জগৎ অন্ধকার দেখিলাম। অন্ধত্ব আসিয়া আমাকে গ্রাস করিতেছে; অর্দ্ধাশনে আট মাস কাটাইয়াছি, কিন্তু অনশন ত অভ্যাস করিতে পারি নাই। অভাগিনী সুলোচনা কাহার দ্বারে দাঁড়াইবে? অশ্রুজলে আমার উভয় গণ্ড ভাসিয়া গেল—আত্মসংবরণ করিতে পারিলাম না।

আমাকে শোকাকুল ও অধীর দেখিয়া প্রবোধ বাবু দয়া করিয়া একখানা গাড়ীতে তুলিয়া আমাকে আমার সেই খোলার ঘরে রাখিয়া আসিলেন। সকল কথা শুনিয়া আমার স্ত্রী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন;

আমাদের উভয়ের পরস্পরকে সান্ত্বনা দেওয়ার কোন সামর্থ্য রহিল না।

প্রবোধ বাবুর পিতা—আমার প্রথম মনিব বসু মহাশয়, দয়াপরবশ হইয়া আমাদের দুজনকে তাঁহার গৃহে লইয়া গেলেন; প্রবোধ বাবু প্রাণপণে আমার চক্ষুর চিকিৎসা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সকল চিকিৎসা বৃথা হইল। ডাক্তার সত্যই বলিয়াছিলেন, চিকিৎসার আর সময় নাই। দুই সপ্তাহের মধ্যে আমার দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হইল; এই চির-দীপ্তিমান, চির দৃশ্যমান পৃথিবীর চির-নবীন শোভা হইতে চির-জীবনের জন্য আমি বঞ্চিত হইলাম।

একদিন বসু মহাশয় কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলিলেন, "ললিত, প্রবোধ বলিতেছিল, চক্ষুর অতিরিক্ত পরিচালনাই তোমার অন্ধত্বের কারণ। আমি কথাটার অর্থ বুঝিলাম না। তোমার অপেক্ষা অনেক বয়োবৃদ্ধ কম্পোজিটারকে আমি জানি, তাহাদের দৃষ্টিশক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই।"

আরাধ্য দেবতা সুদীর্ঘ কালের তপস্যা নিষ্ফল করিয়া দিলে সাধক যেমন হৃদয়ে বেদনা পায়, বসু মহাশয়ের কথায় আমিও তেমনি কষ্ট বোধ করিলাম। হায় বৃদ্ধ, তুমি জান না আমার চক্ষু দুটির উপর আমি কি অত্যাচারই না করিয়াছি! কিন্তু তাহার পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক;—আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

বসু মহাশয় ছাড়িবার পাত্র নহেন। কেন জানি না, আমি অন্ধ হওয়ার পর হইতে আমার প্রতি তাঁহার স্নেহ শত গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল; তাঁহার সে প্রশান্ত মুখচ্ছবি দেখিতে পাইতাম না, কিন্তু তাঁহার করুণার্দ্র কণ্ঠস্বর আমি হৃদয়ে অনুভব করিতে পারিতাম। এ নিরুপায়ের অবলম্বন

স্বরূপ করিয়াই বিধাতা বুঝি তাঁহাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন।

তাঁহার আগ্রহে আমি ধীরে ধীরে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম; প্রথমে আমি মুখ তুলিয়াই কথা বলিতেছিলাম; জন্মান্ধ নহি, অভ্যাস সহজে যায় না। অবশেষে বুঝিলাম, চোখে জল আসিয়াছে; তখন চক্ষু অবনত করিলাম, কিন্তু আত্মগোপন করিতে পারিলাম না; দুরবস্থায় যন্ত্রণায়, শোকে কথা বলিতে বলিতে আমি বসু মহাশয়ের সম্মুখে কাঁদিয়া ফেলিলাম, কিন্তু আমার কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়াই তিনি বলিলেন "ললিত, তোমার জীবনের সার-রত্ন আমিই নিজের হাতে নষ্ট করিয়াছি। কেন তোমাকে বলিলাম না আমার গহনাগুলা কেমিকেল সোণার!—আমি তোমাকে প্রবঞ্চিত করিয়াছি, কিন্তু তুমি অগাধ বিশ্বাসে আমার এই প্রবঞ্চনার কি কঠোর প্রতিফল দান করিলে! তোমার চক্ষু ফিরাইয়া দেওয়ার সাধ্য আমার নাই, কিন্তু যতদিন বসু-বংশে কেহ অভুক্ত না রহিবে ততদিন তোমার ও তোমার স্ত্রীর অন্নের অভাব হইবে না।—তুমি আমাকে ক্ষমা কর।"—বৃদ্ধ দুই হস্তে আমাকে বক্ষে ধারণ করিলেন।

অন্ধের সান্ত্বনার শেষ অবলম্বনটুকু এক মুহূর্ত্তে নির্ব্বাণ হইয়া গেল। বিধাতা আমার চক্ষু গ্রহণ করিয়া আমাকে অনন্ত-দুঃখ দান করিয়াছেন, এখন জীবন গ্রহণ করিয়া মৃত্যু দান করিলেই এ অসহায় পরাশ্রিত হতভাগ্য অন্ধের অন্তিমে শান্তিলাভ হয়। ভগবান, তাহাও কি এত দুর্ল্লভ? *

---

* একটী ইংরাজী গল্পের সামান্য ছায়া অবলম্বনে লিখিত।

পাগল।

বাবু রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশের ফরেক্কাবাদে ওকালতি করিতেন। ফরেক্কাবাদে প্রথম শ্রেণীর উকীল যে কয়জন ছিলেন, রাজেন্দ্রবাবু তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিতেন বটে, কিন্তু তিনি কিছুই সঞ্চয় করিতে পারিতেন না। পরিবারের মধ্যে স্ত্রী ও এক কন্যা মাত্র; এ অবস্থায় তিনি টাকা জমাইতে পারিতেন না কেন তাহা যাহারা তাঁহাকে জানিত, তাহারা বুঝিত। রাজেন্দ্রবাবুর বাড়ী হুগলী জেলায় হরিহরপুর গ্রামে। বড় ভাই বাড়ীর কর্ত্তা, দেশে বিষয় সম্পত্তিও বেশ ছিল, তথাপি রাজেন্দ্রবাবু মধ্যে মধ্যে দাদার কাছে টাকা কড়ি পাঠাইতেন। তিনি মনে করিতেন তাঁহার উপার্জ্জনের অর্থে তাঁহার পিতৃস্থানীয় জ্যেষ্ঠ সহোদরের একটা ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে। উচ্চ শিক্ষিত হইলেও রাজেন্দ্রবাবুর হৃদয় হইতে এই সকল দেশীয় কুসংস্কার বিদূরিত হয় নাই।

রাজেন্দ্রবাবুর কন্যা শুক্লপক্ষের শশধরের মত দিন দিন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। রাজেন্দ্রবাবুর এজন্য বিশেষ চিন্তা ছিল না, কিন্তু তাঁহার দাদা মহেন্দ্রবাবু অষ্টমে গৌরী অথবা নবমে রোহিণী দানের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন; মেয়ের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিবার জন্য তিনি রাজেন্দ্রবাবুকে ক্রমাগত পত্র লিখিতে লাগিলেন। একমাত্র মেয়ে, বিবাহ দিয়া তাহাকে বিদায় করিতে রাজেন্দ্র বাবুর কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না; তাঁহার ইচ্ছা পিতৃমাতৃহীন ভাল ছেলে পাইলে তাহার সহিত ইন্দুর বিবাহ দিয়া জামাইটীকে ঘরে রাখেন। চারিদিকে ছেলের অনুসন্ধান চলিতে

লাগিল; ইন্দু এদিকে একাদশ ছাড়িয়া দ্বাদশবর্ষে পা দিল,—আগামী বৈশাখে ইন্দুর বিবাহ না দিলেই নয়।

অনেক চেষ্টার পর মৈনপুরীর সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র পরেশের সঙ্গে ইন্দুর বিবাহ স্থির হইল। সেরেস্তাদার এক মাত্র পুত্রকে ঘরজামাই রূপে দান করিতে সম্মত হইলেন না; তবে রাজেন্দ্রবাবুর একটা সান্ত্বনা ছিল; মৈনপুরী ফরেক্কাবাদ হইতে বেশী দূর নহে, ইচ্ছা করিলেই মেয়েকে দেখিবার উপায় ছিল। সুতরাং বিবাহে আর কোন আপত্তি রহিল না, বৈশাখের ১৭ই তারিখে ইন্দুর বিবাহ হইয়া গেল। রাজেন্দ্রবাবু কাছারীর কাজকর্ম্ম বন্ধ রাখিয়া প্রিয়তমা দুহিতার সহিত মৈনপুরী যাত্রা করিলেন এবং সপ্তাহের মধ্যেই ইন্দুকে লইয়া বাসায় ফিরিলেন। নিরানন্দময় গৃহ সপ্তাহ পরে আবার আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিল, বিষাদ-মেঘ কাটিয়া গেল। বর্ষার সুনিবিড় জলদজাল ধরণীর মুখ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিলেও অবশেষে যেমন শরতের পীতরৌদ্ররাগ-রঞ্জিত প্রভাতে তাহার শেষ চিহ্ন অপসৃত হয়, বর্ষপরে বঙ্গগৃহ গিরি-দুহিতা উমার সুকোমল পাদস্পর্শে পবিত্র হইয়া উঠে, গৃহে গৃহে আগমনীর সকরুণ-রাগিণীতে বিরহী মাতৃহৃদয়ের উদার-করুণা উদ্বেলিত হইয়া চারিদিক পরিপূর্ণ করিয়া তুলে, ইন্দুকে শ্বশুরবাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া ফরেক্কাবাদের হিন্দু পল্লীর প্রতিগৃহে সকলে সেই সুমধুর ভাব অনুভব করিতে লাগিল। ইন্দুকে সেখানে কে না ভালবাসিত? সকলের স্নেহ হরণ পূর্ব্বক বালিকা তাহার হৃদয়কুসুম পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল।

আশ্বিন মাসে নূতন জামাইকে সঙ্গে লইয়া দেশে আসিবার বন্দোবস্ত হইতেছে; জিনিষ পত্র বাঁধা হইতেছে; যাত্রার দিনও স্থির হইয়া গিয়াছে; এমন সময় একদিন টেলিগ্রাম আসিল, পরেশের বড় অসুখ; তাহার

পিতা ইন্দুকে অবিলম্বে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। রাজেন্দ্রবাবু, স্ত্রী ও কন্যা লইয়া সেই রাত্রেই মৈনপুরী যাত্রা করিলেন; কিন্তু রামলাল বাবুর গৃহে উপস্থিত হইয়া আর পরেশকে দেখিতে পাইলেন না, পরেশ নিদারুণ বিসুচিকায় আক্রান্ত হইয়া মাটির দেহ মাটিতে ফেলিয়া রাখিয়া আলোকহীন, আত্মীয়স্বজনশূন্য এক অনুদ্দিষ্ট অজ্ঞাত দেশে চলিয়া গিয়াছে।

পরেশের সোনার দেহ শ্মশানে ভস্মীভূত করিয়া অন্ধকারময় গৃহে ফিরিয়া আসিয়া রামলাল বাবু দেখিলেন পুত্রবধূকে লইয়া বৈবাহিক উপস্থিত! রাজেন্দ্রবাবু বিদীর্ণ হৃদয়ে গৃহকোণে বসিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। আজ ছয় মাসও যে ইন্দুর বিবাহ হয় নাই! মানুষ যখন শোক-দুঃখ-বিদীর্ণ হৃদয়ে সর্ব্বসুখদুঃখের অতীত সর্ব্বদর্শী বিধাতার কার্য্যের দোষোদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত হয়, তখন সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী নিখিল চক্ষুর অন্তরাল হইতে সম্পূর্ণ উদাসীন দৃষ্টিতে তাঁহার অমোঘ ইচ্ছার শেষফল নিরীক্ষণ করেন; এবং তাঁহার অমর-নেত্র হইতে বিন্দুমাত্র অশ্রুও বিগলিত হয় কি না, তাহা কে বলিতে পারে? স্ত্রী ও কন্যা লইয়া শোকাকুল হৃদয়ে রাজেন্দ্রবাবু কার্য্যস্থলে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার একমাত্র নয়নপুত্তলি, জীবনের অবলম্বন শিশুকন্যা সিঁথির সিন্দুর মুছিয়া চিরদিনের জন্য তাঁহার গৃহে বাস করিতে আসিল। তিনি ভগবানের নিকট কামনা করিয়াছিলেন, তাঁহার কন্যাকে যেন কখন ছাড়িয়া থাকিতে না হয়; ভগবান তাঁহার সেই কামনাই পূর্ণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি কি কখন স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলেন যে, এই ভাবে তাঁহার কামনা পূর্ণ হইবে?

পাষাণ-ভার হৃদয়ে চাপাইয়া, প্রাণের শক্তি চির-বিসর্জ্জন দিয়া রাজেন্দ্র-

বাবু আবার ওকালতি করিতে লাগিলেন। দিন পড়িয়া থাকে না, দিন কাটিতে লাগিল; কিন্তু সে আনন্দ উৎসাহ, সে হাস্য-রসিকতা কোথায়? —দুইটি পরিবারের সকল সুখশান্তি হরণ করিয়া একটি সংসারজ্ঞান-বর্জ্জিত অবোধ বালক ইহকালের পরপারে চির জীবনের জন্য মাথুর যাত্রা করিয়াছে।

২

বিধবা ইন্দুর দুঃখময় জীবনের পাঁচ বৎসর অতীত হইল। রাজেন্দ্র-বাবু অভাগিনী কন্যাকে লইয়া আরও পাঁচ বৎসর ফরেক্কাবাদে কাটা-ইলেন। তাঁহার দাদা দেশে যাইবার জন্য পুনঃপুনঃ তাঁহাকে অনু-রোধ করিয়া পত্র লিখিলেন,—তিনি নিজে পর্য্যন্ত আসিলেন; কিন্তু রাজেন্দ্রবাবু চিরনির্ব্বাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন, দেশে ফিরিলেন না। কি লইয়া, কোন্ সুখের আশায় দেশে যাইবেন? প্রাণের সুখ ও মনের শান্তি যাহার অপহৃত হইয়াছে, বিদেশে ঔদাস্যময় নিভৃত জীবন অতিবাহিত করাই তাহার পক্ষে বাঞ্ছনীয়।

ইন্দুর বয়স ষোল বৎসর। সর্ব্বাঙ্গে যৌবনসৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত। সে সৌন্দর্য্যে মধুরতা আছে প্রখরতা নাই, হিমযামিনীর নীহারপাত-ক্লিষ্টা প্রস্ফুটিতা যূথিকার ন্যায় বৈধব্য-যন্ত্রণা-পীড়িতা যুবতীর সৌন্দর্য্যে একটা অশ্রুসিক্ত কাতরতা বিজড়িত ছিল। পিতামাতা সেই অতুলনীয় সৌন্দর্য্য দেখিয়া গোপনে অশ্রুত্যাগ করেন, মন সংযত করিবার তাঁহাদের কোন উপায়ই ছিল না। ভগবানের প্রতি যাহাদের বিশ্বাস নাই, নির্ভর নাই, সংসারে তাহারা নিগৃহীত ও নিপীড়িত হইলে বলে, "ভগবান এই কি তোমার বিচার? তোমাকে মঙ্গলময় কে বলে?"—কিন্তু

রাজেন্দ্রবাবুর ন্যায় ধর্ম্মভীরু বিশ্বাসী ভগবদ্ভক্তের মুখ হইতে কখন এমন কথা বাহির হইত না; হৃদয় ফাটিয়া চক্ষু দিয়া যখন অশ্রু বহিত, তখন তিনি কাতর দৃষ্টিতে ঊর্দ্ধে চাহিয়া যুক্তকরে বলিতেন, "দয়াময়, হৃদয়ের এ তুষানল নির্ব্বাপিত কর। তোমার রহস্যময় কার্য্যের কারণ আবিষ্কার করি, এত ক্ষমতা আমার নাই। দুর্ব্বল আমি, এ কঠিন পরীক্ষার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।" ইন্দু সকলই বুঝিতে পারিত, তাই সে তাহার হৃদয়ের ভাব গোপনে রাখিবার চেষ্টা করিত, পিতামাতার সম্মুখে প্রফুল্ল ভাব দেখাইবার জন্যও তাহার আগ্রহ ছিল; কিন্তু সূর্য্য যখন অস্ত যায়, তখন ক্ষুদ্র প্রদীপ তাহার সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়াও অন্ধকার বিদূরীত করিতে পারে না।

নিজের রূপের উপর ইন্দু একটা প্রাণব্যাপী অবহেলার ভাব প্রকাশ করিত, রূপকে সে নিজের জীবনের অভিশাপস্বরূপ মনে করিত। সে সমস্ত অলঙ্কার, অনিচ্ছার সহিত নহে, বিড়ম্বনা-জনক বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিল; মোটা সাদা থান পরিত, শয্যাত্যাগ করিয়া কঠিন মৃত্তিকার উপর গড়াইত এবং দেহকে নিগৃহীত করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিত না। কিন্তু তাহাতেও তাহার সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইল না; প্রাসাদবাসিনী, হীরকরত্নালঙ্কার-ভূষিতা বিলাসশয্যা-শায়িনী সুন্দরীর সৌন্দর্য্য তাহাতে ছিল না; যৌবনে ব্রহ্মচারিণী, সংযতহৃদয়া যোগিনীর ন্যায় সে সুন্দরী; দেবচরণে নিবেদিত, ধূপচন্দনের স্নিগ্ধ মিশ্রগন্ধে সুরভিত বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায় তাহার সৌন্দর্য্য; বিধাতার চরণে আত্মসমর্পণের জন্যই তাহার সৃষ্টি, বালিকা তাহা বুঝিতে পারিত। তাই বিগলিতনয়না বিধবার হৃদয়ের ভার যখন অসহ্য হইয়া উঠিত, কোন সুখের স্মৃতি, কোন কোমলস্পর্শ, কৌমুদী-সম্পাতে স্বচ্ছসলিলা প্রবাহিনীর

মুক্ত হাসির মত কোন প্রসন্ন হাস্যচ্ছটা বিস্মৃত অতীতের স্বপ্ন-আবরণ ভেদ করিয়া বালিকার হৃদয়ে যখন ধীরে ধীরে সমুদিত হইত, তখন অভাগিনী ইন্দু আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিত না, সকলের লক্ষ্য হইতে দূরে দ্বিতলস্থ তাহার নিভৃত কক্ষটিতে প্রবেশ পূর্ব্বক দ্বার বন্ধ করিয়া দিত, এবং মর্ম্মরশুভ্র মেঝের উপর পড়িয়া লুটাইয়া আকুল হৃদয়ে বলিত, "হে অনাথনাথ, হে হরি, আমার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া আমাকে কাঙ্গালিনী করিয়াছ, আমার এ মনের আগুনও নিবাইয়া দাও। আমার সুখের দুঃখের সকল স্মৃতি, আমার জীবন মরণের সকল কষ্ট গ্রহণ করিয়া তোমার অভয় চরণে স্থান দাও, আমি আর সহ্য করিতে পারি না প্রভু!"—শোক-ভার লাঘব হইলে, ইন্দু ধীরে ধীরে গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত হইত। মা কোন কোন দিন তাহার অশ্রুসজল ভাব ধরিয়া ফেলিতেন; নিঃশ্বাস ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন—"ইন্দু, তোর চোখ ভিজে ভিজে লাগচে যে, কেঁদেছিস বুঝি?"—বলিতে বলিতে মায়ের চোখে মোটা মোটা দুইটি মুক্তাবিন্দু দেখা দিত। ইন্দু হাসিয়া তাহার চোখের জলে সিক্ত, সরল, আদরপূর্ণ, কোমল স্বরে বলিত—"মরণ! কাঁদবো কোন্ দুঃখে। চোখে বুঝি কি একটা পোকা পড়েছিল।"—মা বৈধব্য-যন্ত্রণা জানিতেন না; ইন্দু মনে করিত, মাকে খুব ফাঁকি দেওয়া গেল! হায় সরলা, নিজের কষ্ট সে সহিত, কিন্তু মা বাপের কষ্ট সহ্য করিতে পারিত না, তাই নিজের যন্ত্রণা লুকাইতে গিয়া তাঁহাদের অধিকতর যন্ত্রণার কারণ হইত।—এমনই করিয়া দিন কাটিতে লাগিল।

যাহাহউক, এ ভাবে দিন কাটিলেও কথা ছিল না, কিন্তু তাহাও কাটিল না। একদিন কাছারী হইতে ফিরিয়া রাজেন্দ্রবাবুর শরীর সামান্য অসুস্থ হইল, রাত্রে সেই অসুখ বাড়িল। ডাক্তার আসিলেন, ঔষধের

ব্যবস্থা হইল, রীতিমত চিকিৎসা চলিতে লাগিল; কিন্তু পীড়ার উপশম হইল না। ঘোরতর জ্বরবিকারে তাঁহার কয়েক দিন অতিবাহিত হইল। বিকারের ঘোরে তিনি কেবল 'পরেশ' 'পরেশ' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। তাহার পর একদিন রাত্রিশেষে, উষার আলোক-লেখায় চরাচর আলোকিত হইবার পূর্ব্বেই রাজেন্দ্র বাবুর দেহপিঞ্জর হইতে প্রাণপক্ষী বহির্গত হইয়া জামাতার উদ্দেশে কোন্ অনুদ্দিষ্ট পথে চলিয়া গেল। সকলই ফুরাইল! উচ্চ সৌধ-বাতায়ন হইতে দুইটি নিরুপায় বিধবার আর্ত্তনাদ ও দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হইয়া শূন্যে বিলীন হইতে লাগিল। বায়ুহিল্লোলিত শান্তিময় সুন্দর প্রভাতে দুইটি হতভাগিনীর নয়ন সমক্ষে জীবনব্যাপী নৈশ অন্ধকার বিশ্বের বিষাদ এবং অনন্ত দুঃখ আনিয়া তদ্দ্বারা তাঁহাদিগকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

৩

আর একদিনও ফরেক্কাবাদে থাকা চলে না। কোন্ আশায়, কি অবলম্বন করিয়া দুইটি নিরাশ্রয়া বিধবা এই শূন্যময় বিদেশে দুর্ব্বহ জীবন বহন করিবেন? ইন্দুর মা বিধবা কন্যার হাত ধরিয়া হরিহর-পুরে ফিরিয়া আসিলেন। নয় বৎসর পরে মা ও মেয়ে থানের ধুতি পরিয়া, কাঙ্গালিনী বেশে, অশ্রুপূর্ণ নেত্রে গ্রামে প্রবেশ করিলেন; গৃহে ক্রন্দনরোল উঠিল। গ্রামে রাজেন্দ্রবাবুর খ্যাতি ছিল; সকলেই তাঁহার দানশীলতা, ও পবিত্র স্বভাবের প্রশংসা করিত। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দুঃখিত হইল; সকলেই বলিতে লাগিল, এমন সোণার সংসার এতদিনে ছারেখারে গেল! এমন গৃহে কি কখন এমন বজ্রাঘাত হয়?

ইন্দুর অপূর্ব্ব রূপ, তাহার অসামান্য গুণ দেখিয়া গ্রামের লোকের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ইন্দুর বয়স যখন আট বৎসর, তখন ইন্দুকে তাহার বাবা কর্ম্মস্থানে লইয়া গিয়াছিলেন। এই নয় বৎসরের মধ্যে কি অসাধারণ পরিবর্ত্তন! সকলে বলিতে লাগিল, মুখুয্যে মহাশয়ের মেয়ে সাক্ষাৎ ভগবতী; এমন মেয়েও বিধবা হয়! সকলই ভগবানের ইচ্ছা!

পল্লীগ্রামের গৃহস্থঘরের মেয়েরা অন্তঃপুরবদ্ধা নহেন। পাড়ার সকলের বাড়ীতেই তাঁহাদের গতিবিধির প্রথা আছে; স্নানের জন্য পুকুরঘাটেও তাঁহাদের যাইতে হয়। ইন্দুর এ অভ্যাস ছিল না; প্রথম প্রথম তাহার কিছু বাধবাধ ঠেকিত, তাহার পর ক্রমে তাহার অভ্যাস হইয়া গেল। গভীর শোকের কঠোর আঘাতে তাহার হৃদয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; সে সর্ব্বদা হৃদয়ের উপর দুঃসহ পাষাণভার অনুভব করিত। পল্লীগ্রামের দৃশ্য-বৈচিত্র্যের মধ্যে আসিয়া, পল্লীবাসিনী মধুরহৃদয়া রমণীগণের সাহচর্য্য ও অকৃত্রিম সহানুভূতি লাভ করিয়া ক্রমে তাহার হৃদয় সংযত হইয়া আসিল। যে শোকের প্রথম আঘাতে মানুষ মনে করে তাহাতেই প্রাণবিয়োগ হইবে, সে আঘাতও ক্রমে সহিয়া যায়; হৃদয়ের ক্ষত ক্রমে শুকাইয়া উঠে, আবার মুখে হাসি আনিতে হয়, সংসারের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয়, এবং নূতন নূতন সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা লইয়া জীবনের খেলাঘরে বসিয়া দিনযাপন করা আবশ্যক হইয়া উঠে। ইহাই বিধাতার নিয়ম; নতুবা প্রাণের শ্রেষ্ঠ বন্ধন ছিঁড়িয়া গেলে, কে সংসারে থাকিতে পারিত?

একদিন ইন্দু প্রতিবেশিনী কয়েকটী বধূর সহিত তাহাদের পুকুর ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছে। এ পুকুরে পাড়ার স্ত্রীলোকেরা স্নান করেন বলিয়া গ্রামস্থ পুরুষেরা এদিকে আসেন না। সেদিন দক্ষিণ-

পাড়ার বসিরদ্দি মণ্ডলের পুত্র আমির মণ্ডল পুকুরের ধারে জলের উপর ঝুঁকিয়া-পড়া খেজুর গাছটা ঝুরিতে উঠিয়াছিল। স্নানের ঘাটে রমণী-কণ্ঠস্বর শুনিয়া গাছ কাটিতে কাটিতে আমির একবার সেই দিকে চাহিয়া দেখিল—দেখিল এক পরী আস্‌মান হইতে নামিয়া, আগ্রীব নিমজ্জিত হইয়া স্নান করিতেছে; তাহার রূপের ছটায় পুকুরঘাট আলোকিত হইয়াছে। এত রূপ, এমন শোভা বেচারী তাহার জীবনে কখন দেখে নাই। সে গাছ কাটা ভুলিয়া গেল; চক্ষু ভরিয়া আমির ইন্দুর রূপসুধা পান করিতে লাগিল। উনিশ বৎসর বয়সের মুসলমান যুবক, মাথায় লম্বা চুল, গৌরবর্ণ, অল্প গোঁফের রেখা দিয়াছে; আমির তাহার যৌবনে নারীর রূপ দেখিয়া কখন পাগল হয় নাই; আজ সে এই বিধবা যুবতীর রূপের সাগরে ডুবিয়া গেল। সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের মেয়ে, ব্রাহ্মণকন্যা, তাহা তাহার মনেই আসিল না; তাহার মনে তখন আর কোন কথাই ছিল না, সকল ইন্দ্রিয়পথ দিয়া রূপের আবর্ত্ত তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছিল; তাহার দেহের প্রত্যেক ধমনীতে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সঞ্চার হইল; তাহার সমস্ত দেহ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল; তাহার অবশ হস্ত হইতে গাছ কাটিবার অস্ত্র পুকুরের জলে ঝুপ করিয়া পড়িয়া গেল।—তখন সহসা তাহার চৈতন্যোদয় হইল এবং স্নানার্থিনী রমণীগণের দৃষ্টি তাহার দিকে আকৃষ্ট হইল। তাঁহারা দেখিলেন, একটী মুসলমান যুবক খেজুর গাছ হইতে নীচে নামিতেছে। সেদিকে আর লক্ষ্য না করিয়া রমণীগণ পূর্ব্ববৎ স্নান করিতে লাগিলেন। পুকুরের ধারে পক্কপ্রায় সোণার ধান শরৎ প্রভাতের বায়ুহিল্লোলে হিল্লোলিত হইতে লাগিল; শিমুলগাছের অগ্রভাগে বসিয়া একটা দহিয়াল পুচ্ছ খুলিয়া মুক্তপ্রাণে গান গাহিতে লাগিল

এবং শুভ্র মেঘখণ্ড রৌদ্র-প্রদীপ্ত নির্ম্মল আকাশে ভাসিয়া চলিতে লাগিল।

মণ্ডলপুত্র আমির গাছ হইতে নামিয়া আর জলের মধ্যে অস্ত্রের সন্ধান করিল না। পুকুরধারের কালকাসিন্দার বেড়া ডিঙ্গাইয়া, লাল ভেরেণ্ডার জঙ্গল দুই হাতে ঠেলিয়া অদূরবর্ত্তী ধানের জমিতে উঠিয়া একটা আইলের উপর দুই জানুর ভিতর মাথা দিয়া বসিয়া পড়িল। বিশ্ব-সংসার তাহার মাথার মধ্যে ঘুরিতে লাগিল; আজ সে উন্মত্ত, বাহ্যজ্ঞানশূন্য। একবার সে জানুর উপর দুই হাতের ভর দিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কি ভাবিয়া আবার বসিয়া পড়িল। অনেকক্ষণ পরে আবার উঠিল, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মাথা নীচু করিয়া চোরের মত পা টিপিয়া পুকুরধারে কালকাসিন্দার বেড়ার নিকটে গেল; অত্যন্ত আগ্রহপূর্ণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বেড়া একটু ফাঁক করিয়া দেখিল,—ঘাট অন্ধকার, ঘাটে কেহ নাই। আমির বাঁধা ঘাটে আসিয়া বসিল, সে কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল অদূরে গাঙ্গুলী-বাড়ীতে দুইজন বাউল খঞ্জনী বাজাইয়া সমস্বরে গাহিতেছে—

"একদিনও না দেখিলাম তারে,
আমার ঘরের কাছে আরসী নগর,
তাতে এক পড়সী বসত করে।"

৪

সেই দিন হইতে আমির কাজ-কর্ম্ম ছাড়িয়া দিল। প্রথমে কয়েক দিন বাড়ীর বাহির হইল না; কেবল হাঁটুর মধ্যে মাথা দিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবে, আর এক একবার মাথা তুলিয়া কাতর দৃষ্টিতে যেন কাহাকে দেখিতে চায়। বৃদ্ধ পিতা ভাবিয়া অস্থির, মাতা কাঁদিয়া আকুল। মণ্ডলের এক-

মাত্র লায়েক পুত্র—সংসারের অবলম্বন, ভাল করিয়া খায় না, কোথাও যায় না, একেবারে নির্ব্বাক্। কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তরের জন্য পীড়াপীড়ি করিলে সজলনয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে—সে দৃষ্টি অর্থশূন্য, ভাবশূন্য,—উন্মাদের ন্যায় শূন্যদৃষ্টি।

অবস্থা সঙ্গীন দেখিয়া আমিরের পিতা পাড়ার ও ভিনপাড়ার মাতব্বর ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিল। সর্দ্দার, ঘরামী, সেখ ও মাল্‌তে মহাশয়েরা তাহার দাবায় আসিয়া অধিষ্ঠান করিল। প্রতিবেশী হবিবুল্লা সরদারের অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধা জননীও সেই দাবার একপ্রান্তে উপবিষ্টা। সকলেই একবাক্যে বলিল, ছেলের উপর পরীর দৃষ্টি হইয়াছে; সে বিষয়ের অনেক প্রমাণ প্রয়োগও হইল; নানা জনে পরীর দৃষ্টি সম্বন্ধে অনেক অসম্ভব গল্প বলিল; খুব উৎসাহে থরসান পুড়িতে লাগিল; অবশেষে হবিবুল্লার মা কিছু তুকতাকের প্রস্তাব করিল। তুকতাক হইল; জলপড়া, তেলপড়া, শরষেপড়া, ঝাড়াফুক মন্ত্র কিছুরই অভাব হইল না; কিন্তু সমস্তই নিষ্ফল হইল। অবশেষে সেখপাড়ার পরমবিজ্ঞ উজীর মাল্‌তে বলিল, "বলি ও মণ্ড-লের পো, পীরের দরগায় পাঁচ পয়সার গুড়ে পাটালীর সিন্নি দাও না।" সিন্নি দেওয়া হইল, তাহাতেও কোন ফল পাওয়া গেল না। তখন কাশিমপুরের শ্রেষ্ঠ গুণিন হানিফ সেখ রোজাকে আনাইবার ব্যবস্থা হইল। আমির প্রতিদিন একভাবে বসিয়া থাকে; কতজনে কত কথা বলিয়া যায়, আমিরের কানে কোন কথা প্রবেশ করে না; বুঝি সেই ব্রাহ্মণকন্যার রূপরাশি তাহার সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তি অপহরণ করিয়াছে, তাহার দেহ অসাড় করিয়া ফেলিয়াছে।

পরদিন রোজা আসিল, অনেক মন্ত্র আওড়াইল, অনেক জলপড়া দিল, পাঁচবার করিয়া ঝাড়িল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। "শক্ত

পল্লীতে নাগাল লইয়াছে, আপনি না গেলে কেহ তাড়াইতে পারিবে না,” এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া রোজা ঘরে গেল।—আমিরের মা দাওয়ায় পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিল, তাহার সকল আশাই বিলুপ্ত হইল।

৫

আমিরের স্কন্ধে যে শক্ত ভূত চাপিয়াছিল, সে সহজে নামিল না। আমিরের পিতা মাতা নিরাশ হইল; এমন কর্ম্মক্ষম ছেলেটির এমন দশা দেখিয়া তাহারা জীবন্মৃত হইয়া পড়িল। তাহাদের মনে হইল, কে যেন তাহাদের অন্নের গ্রাস মুখ হইতে কাড়িয়া লইয়া গেল;—কে যেন তাহাদের অন্ধের নড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিল। চিকিৎসা আর কি করিবে? এত বড় ওঝা যখন হার মানিয়া গেল, তখন আর চিকিৎসা নাই। এখন ভরসা আল্লা! সেই আল্লার উপর নির্ভর করিয়াই আমিরের বাপ মা চুপ করিয়া রহিল।

সকলে মনে করিয়াছিল, আমিরের উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইবে; কিন্তু সে সব কিছুই হইল না। আমির কয়েক দিন বাড়ীতেই বসিয়া রহিল; দিবারাত্রি বুঝি তাহার হৃদয়ের মধ্যে দেবাসুরের যুদ্ধ চলিতেছিল। শেষে অসুরেরই জয় হইল। আমির আর গৃহে তিষ্ঠিতে পারিল না। কিন্তু কেমন করিয়া সে ব্রাহ্মণবাড়ীতে যাইবে? সেখানে গেলে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, “কেন আসিয়াছ? কি চাও?” তাহা হইলে সে কি জবাব দিবে? লোকে যদি তাহাকে সন্দেহ করে, তাহা হইলে কি হইবে? অনেক ভাবিয়া শেষে আমির স্থির করিল, সে পুকুরের তীরে কোন স্থানে বসিয়া থাকিবে; ব্রাহ্মণকন্যা নিশ্চয়ই স্নান করিতে, জল লইতে, দুই চারি-বার ঘাটে আসিবে; তাহা হইলেই তাহার সাধ মিটিবে। সে ত আর

কিছুই চাহে না, শুধু সেই দেবীপ্রতিমা দেখিতে চায়, সুধু এক একবার দেখামাত্র। রূপমুগ্ধ যুবক মনে ভাবিয়াছিল, সেই সুন্দরীর রূপ এক একবার করিয়া দেখিলেই বুঝি তাহার হৃদয় শীতল হইবে।

একদিন প্রাতে উঠিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া আমির সেই পুকুরের ধারে খেজুরতলায় গিয়া বসিয়া রহিল। পুকুরের ঘাটের দিকে সরলভাবে চাহিতে তাহার সাহসে কুলাইতেছিল না; সে ভয়ে ভয়ে ঘাটের দিকে পিছন করিয়া বসিয়া ছিল; কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া তাহার যেন মনে হইতে লাগিল, কে তাহাকে উঁচু করিয়া ধরিয়া তাহার মুখখানা সজোরে পুকুরের দিকে ফিরাইয়া দিতেছে। হায়, হায়! মণ্ডলের ছেলে সত্য সত্যই পাগল হইল।

ঘাটের দিকে একটু শব্দ হইলেই আমির চোরের মত চাহিয়া দেখে। বেলা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। কত স্ত্রীলোক স্নান করিতে আসিল; কত হাস্যপরিহাসে পুকুরের ঘাট পরিপূর্ণ হইল; কত জন স্নান করিয়া চলিয়া গেল। বেলা হইল, কিন্তু বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা ত স্নান করিতে আসিল না। তবে কি সে আজ স্নান করিবে না? কেন? হয় ত তাহার অসুখ হইয়াছে, তাই সে আজ স্নানে আসিল না। অসুখের কথা মনে হইতেই আমির কেমন হইয়া গেল। তখন সে ব্রাহ্মণবাড়ীতে গিয়া কোন প্রকারে সংবাদ লইতে কৃতসঙ্কল্প হইল।

পুকুরের ধারের সেই কালকাসিন্দার বেড়ার ভিতর দিয়া বাহির হইয়া মাঠ পার হইয়া আমির রাস্তায় উঠিল। সেইটি পুকুরের রাস্তা। একটু অগ্রসর হইয়াই একটা মোড় আছে; আমির সেই মোড় ফিরিয়াই দেখে, সম্মুখে পথের মাঝখান দিয়া ব্রাহ্মণকন্যা একাকিনী একটী

কলসী কক্ষে স্নান করিতে আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়াই আমির ক্ষণকালের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইল;—তাহার পর এক দৌড়ে পলায়ন।

৬

আমির সত্যসত্যই পাগল হইয়াছে। তাহার মুখে কথা নাই; সারাদিন মুখোপাধ্যায়দের বাহির-বাড়ীর উঠানের পাশে একটা লম্বা ঘরের বারান্দায় পড়িয়া থাকে। সারাদিন সে সেখান হইতে নড়ে না, কোথাও যায় না; রাত্রে উঠিয়া খানিকক্ষণ রাস্তায় দৌড়িতে থাকে। তাহার বাপ মা কতদিন তাহাকে জোর করিয়া বাড়ী লইয়া গিয়াছে; হাত পা বাঁধিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু যদি কোন প্রকারে সে একবার ছাড়া পাইয়াছে, অমনি এক দৌড়ে ব্রাহ্মণবাড়ীর বারান্দায় আসিয়া হাজির! কাহারও সহিত সে কথা কহে না, কাহারও প্রতি কোন অত্যাচার করে না, শুধু সেই বাড়ীর ভিতরকার দ্বারের দিকে চাহিয়া সে বসিয়া থাকে।

বিধবা ইন্দুর হৃদয় এই পাগলের দুঃখে গলিয়া গেল। আহা, এমন জোয়ান ছেলে, পাগল হইয়া গেল! এই কথা সর্ব্বদাই তাহার মনে হইত। প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে সে পাগলকে ভাত দিয়া যাইত। একখানি কলাপাতায় করিয়া ভাত ব্যঞ্জন দিত; আর একটা মাটীর ভাঁড় ছিল, তাহাতেই জল দিত। ইন্দু প্রথম প্রথম ভাত দিয়াই চলিয়া যাইত; কিন্তু বিকালে কি অন্য সময়ে আসিয়া দেখিত, যেমন ভাত তেমনি পড়িয়া আছে; তখন দয়াময়ী ইন্দু সেখানে দাঁড়াইয়া যেই বলিত, "আমির, ভাত খাও" আর অমনি পাগল গোগ্রাসে ভাতগুলি খাইয়া ফেলিত। ইন্দু বলিত "আমির, পাতখানি ফেলিয়া মুখ ধুইয়া এস;" আমির অবিলম্বে আদেশ পালন করিত।

ইন্দুর এখন এক কাজ বাড়িল;—প্রতিদিন পাগলকে খাওয়ান। জ্যেঠামহাশয় এক এক দিন দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেন, আর বলিতেন, "মা আমার অন্নপূর্ণা,—আমার মায়ের গুণে পাগলও বশ হয়।" হায় ব্রাহ্মণ, কি বুঝিবে তুমি!

আর কি আত্মসংবরণ, কি ইন্দ্রিয়জয়ের শক্তি ঐ নিরক্ষর চাষার ছেলে আমিরের! তাহার সাধনার ধন, তাহার জীবনের অবলম্বন, তাহার তৃষ্ণার জল, তাহার কল্পনার সর্ব্বস্ব প্রতিদিন তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়; তাহার ক্ষুধায় অন্ন, পিপাসার জল দিয়া যায়; কিন্তু যে ক্ষুধায় তাহার প্রাণ জ্বলিতেছে, যে মহাতৃষ্ণায় তাহার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, আমির তাহা হৃদয়ের অন্তস্তলে লুকাইয়া রাখিয়াছে, একদিনও সে ভাল করিয়া তাহার আরাধ্যা দেবীর মুখের দিকে তাকাইতে পারিল না।

এই ভাবে পাগলের দীর্ঘ তিন বৎসর কাটিয়া গেল। পাগল ব্রাহ্মণ-বাড়ীর বারান্দায় দিন কাটাইতে লাগিল।

একদিন দ্বিপ্রহরে তাহার খাবার আসিল না। কি হইয়াছে,—পাগল তাহা ভাবিয়া পাইল না। ক্ষুধা তাহার ছিল না, ক্ষুধাতেও সে কাতর নহে; রূপের তৃষ্ণায় তাহার হৃদয় নিশিদিন জ্বলিয়া যাইতেছে। যাহার রূপ দিনান্তে একবার দেখিতে পাইলেও তাহার তৃষিত প্রাণ শীতল হয়, সে কৈ? আমির অধীর ভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে ইন্দুর মা আসিয়া তাহাকে ভাত দিয়া গেলেন। পাগল ভাবিল, এমন ত হয় না; ব্রাহ্মণকন্যা ভিন্ন এ তিন বৎসর আর ত কেহ তাহাকে খাইতে দেয় নাই, একটি মিষ্ট কথা বলে নাই, করুণ নেত্রে তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহে নাই। আজ তাহার কি হইয়াছে, কেন সে

আসিল না। আমির ভাতের পাতা সম্মুখে রাখিয়া ভাবিতে লাগিল, ভাতগুলি শুকাইতে লাগিল। সেদিন আর তাহার খাওয়া হইল না।

বিকালে পাগল শুনিল, ইন্দুর বড় জ্বর হইয়াছে; তাহার পর শুনিল জ্বর আরও বাড়িয়াছে, চক্ষু লাল হইয়া উঠিয়াছে, ইন্দু নাকি সবেগে বালিসের উপর মাথা লুটাইতেছে প্রলাপ বকিতেছে। অবশেষে বৃদ্ধ কবিরাজ প্রেমচাঁদ নিদান-রত্নকে ডাকা হইল; কবিরাজ মহাশয়ের নাড়ীজ্ঞান অসাধারণ। তিনি নস্য টানিয়া, নাড়ী টিপিয়া বলিলেন, "এ সান্নিপাতিক বিকার, বাঁচিবার আশা নাই। মধু দিয়া খলে মাড়িয়া এই ঔষধ এক প্রহর অন্তর খাওয়াও। আবার সন্ধ্যার পর আসিব"—চাদরের খুঁট হইতে ঔষধ বাহির করিয়া কবিরাজ তাহা ইন্দুর মার হাতে দিয়া গেলেন। ইন্দুর মা সজল নেত্রে কন্যাকে ঔষধ খাওয়াইতে বসিলেন।

সমস্ত দিন আমির জ্বলন্ত দীপশিখার চতুর্দ্দিকে পতঙ্গের মত ইন্দুদের বাড়ীর চারিদিকে ঘুরিল। আজ সকলেই ব্যস্ত, কেহ তাহাকে খাইতে বলিল না, সেও কিছু খাইল না, অনাহারে অস্থির ভাবে বাড়ীর চারি[illegible] ঘুরিতে লাগিল; এক একবার বিহ্বল দৃষ্টিতে ইন্দুর শয়ন-[illegible] চাহিতে লাগিল, এক একবার মাটিতে পড়িয়া দুই হাতের মধ্যে মুখ [illegible] নিশ্চল ভাবে রহিল, বোধ হয় সে মনে মনে প্রার্থনা করিতেছি[illegible] আল্লা, আমার এই আশাহীন, উদ্দেশ্যহীন প্রাণের [illegible] রক্ষা কর।"

কিন্তু আল্লা তাহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। [illegible] বাড়ীতে মহা ক্রন্দনের রোল উঠিল। সকল দুঃখ, সকল [illegible] হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া পুণ্যবতী সতী আনন্দধামে চলি[illegible]

আমির সমস্ত রাত্রি বসিয়া কাটাইতেছিল। ক্রন্দনের শব্দে সে বুঝিল, সব ফুরাইয়াছে! আর সে সেখানে বসিয়া থাকিতে পারিল না; সে ছুটিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার পর সেই অন্ধকার রাত্রে বাঁশতলা দিয়া, শ্যাওড়াবন পার হইয়া, ধানের জমি অতিক্রম করিয়া, কালকাসিন্দার বেড়া ডিঙ্গাইয়া পুকুরের বাঁধা ঘাটে গিয়া বসিল; দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুকরাইয়া কাঁদিতে লাগিল। শর্ব্বরী প্রভাতকল্পা, পূর্ব্ব গগন ঈষৎ পরিষ্কার হইয়াছে, আকাশের ম্লান নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব পুকুরের জলে পড়িয়াছে, ধীরে ধীরে শীতল সমীরণ আমিরের দীর্ঘ কেশগুচ্ছ কম্পিত করিতেছে। আমির জলের ধারে নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকিল, কেবল এক একবার দীর্ঘনিঃশ্বাস তাহার যন্ত্রণামথিত বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া শূন্যে বিলীন হইতে লাগিল।

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পথে "বল হরি, হরিবোল" শব্দ উঠিল। সেই শব্দে আমিরের সংজ্ঞা হইল, সে উঠিয়া দাঁড়াইল। উন্মত্তের ন্যায় ধানের ক্ষেতের ভিতর দিয়া দূরে দূরে মৃতদেহের অনুসরণ করিতে লাগিল। এক ক্রোশ দূরে কালীগঙ্গা নদী। নদীতীরে শ্মশান-ঘাটে ইন্দুর মৃতদেহ নামান হইল, শববাহকগণ চিতার উপর সেই পুষ্পময় দেহ তুলিয়া দিল। দীর্ঘ কেশ লুটাইয়া পড়িয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ শ্বেত বস্ত্রে আবৃত, চক্ষু নিমীলিত, এত কঠিন রোগেও মুখের শোভা নষ্ট হয় নাই; মৃত্যুর যন্ত্রণাহীন, চিন্তারহিত, সঙ্কোচশূন্য ক্রোড়ে শয়ন করিয়া যুবতী বিধবা নিদ্রা যাইতেছে। একটা গাছের আড়াল হইতে আমির নির্ণিমেষ নেত্রে সেই অন্তিম শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। আজ আর পাগল কিছুতেই হৃদয়কে সংযত করিতে পারিল না। তিন বৎসর ধরিয়া হৃদয়ের সহিত মহাসংগ্রামে সে জয়ী হইয়াছে, আজ তাহার দৃঢ়তা ও ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, আজ তাহার পরাজয়ের দিন। উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া সে ইন্দুর চিতার উপর আসিয়া

পড়িল। শববাহীগণ নিকটেই ছিল, তাহারা মহা ব্যস্তভাবে "হাঁ হাঁ, করিস্ কি, ছুঁস্‌নে ছুঁস্‌নে।" বলিয়া দৌড়িয়া আসিয়া তাহাকে সরাইয়া দিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে পাগলের মোহ ছুটিয়া গেল, সে তৎক্ষণাৎ এক দৌড়ে সেখান হইতে অন্তর্ধান করিল। কোথায় গেল, কেহ বলিতে পারিল না।

সেই হইতে পাগল নিরুদ্দেশ। কেবল এক একদিন রাত্রিশেষে কালীগঙ্গা দিয়া নৌকা বাহিয়া যাইতে যাইতে মাঝিরা শ্মশান-ঘাটের কাছে আসিয়া সভয়ে শুনিত, নদীর ধারে শ্মশানের উপর লুণ্ঠিত হইয়া কে একজন "হায় আল্লা, হায় আল্লা" করিয়া গভীর শোকে হৃদয় ফাটাইয়া কাঁদিতেছে; নৈশ বায়ুপ্রবাহে তাহার সেই নিরাশা-শুষ্ক বিদীর্ণ কণ্ঠস্বর শূন্যে ভাসিয়া যাইতেছে, এবং তাহার পদতল দিয়া চলচঞ্চলা নদী কল-প্রবাহে ছুটিয়া চলিয়াছে।

প্রতীক্ষা।

ছেলেবেলা হইতে সভা সমিতিতে বক্তৃতা শোনার খেয়াল আমার মাথায় ভূতের মত চাপিয়া বসিয়াছিল। হিন্দু, ব্রাহ্মণের পুত্র, গৃহে অর্থসঙ্গতিও কিছু ছিল; বাবা চক্ সোণাদিঘীর নায়েবী করিতেন, শুনিয়াছি তাঁহার লাঠির প্রতাপে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল পান করিত। কিন্তু আমার নিকট তিনি চির-করুণাময় ছিলেন। এ রকম পিতা লাভ করা সৌভাগ্যের কথা।

যাক, কি বলিতেছিলাম, বলি। গ্রামের স্কুলে ছাত্রবৃত্তি ক্লাস পর্য্যন্ত উঠিতেও তর সহিল না,—কলিকাতায় না পড়িলে কি বিদ্যা হয়? যুক্তি দ্বারা পিতাকে বুঝাইলাম কলিকাতায় পড়িলে অবিলম্বেই চাণক্যের মত পণ্ডিত হইয়া শ্রীচরণে ফিরিয়া আসিব। পুত্রের বিদ্যাধিক্যের সম্ভাবনায় বাবা কিছুমাত্র আপত্তি না করিয়া আমাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন।

ছাত্রবৃত্তি স্কুলে পড়া, মস্ত লম্বা, পাড়াগেঁয়ে অসভ্য, তের বৎসরের একটা ছেলে হেয়ার স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইল। ক্লাসে উপস্থিত থাকা ক্লাসের ছেলেদের এবং আমার পক্ষে সমান ক্লেশকর হইয়া উঠিল। আমি বাড়ীতে দুইখানা 'রয়েল রিডার' পড়িয়া ইংরাজী বিদ্যারূপ অকূল সমুদ্রের অপর পার অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। কলিকাতার একদল ক্ষুদ্র বালকের মধ্যে পড়িয়া ঘন ঘন আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে লাগিল। আমি ক্লাসে পড়িতে দাঁড়াইলে কেহ বলিত "মৈনাক হিল," কেহ বলিত "Man-mountain," বসিয়া থাকিলে বলিত "কুমারবাহাদুর অঙ্গদ"।—আমি মহা বিরক্ত হইয়া রিফরমেশনের জন্য প্রাণপণ করিলাম।

দুই চারি বৎসরের মধ্যে আমার রিফরমেশন হইয়া গেল। সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা বুদ্ধি কিছু কম ছিল না; আমি সভাসমিতিতে যোগদান করি, বক্তৃতার সময় সজোরে করতালি দিই। সেই সময় হইতেই সভাসমিতিতে আমার বক্তৃতা শোনার খেয়াল। যিনি যাহা বলিতেন সকলই ধ্রুব সত্য মনে হইত; কেশব বাবুর বক্তৃতা শুনিয়া পরব্রহ্মের একটি সুনির্ম্মল জ্যোতির সত্তায় আমার হৃদয় পূর্ণ হইত; কর্ণেল অল্‌কটের বক্তৃতা শুনিয়া আমি লম্বা চুল রাখিলাম, তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিয়া সে সময়ে গৈরিক বস্ত্র পরিতাম। একদিন মা আমার এই বেশ দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "নবীন সন্ন্যাসী"। মার মুখে সেই একবার মাত্র সে কথা শুনিয়াছিলাম; তাহার পর মা স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন, আর দেখা হয় নাই।

প্রতি বৎসর যথানিয়মে প্রমোসন পাইলেও এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলাম না। সভাসমিতিতে যোগদান, কি দুর্ভিক্ষের চাঁদা আদায়, কিম্বা ঐ রকমের কোন একটা অবিনশ্বর কার্য্যে জীবনের অমূল্য সময়টুকু ব্যয় করিয়াছিলাম; পড়াশুনা হয় নাই। ফেল করিয়া বাড়ী গিয়া বসিলাম।

বাবা তাতেই সন্তুষ্ট; বলিলেন, "এক পুরুষে বেশী বিদ্যা সহ্য হবে না, বাপু, যা শিখেছ তাই ঢের। বিয়ে থাওয়া দিয়ে একটি বৌমা এনে ঘর সংসার করি। তোকে ত আর চাকরী করতে হবে না।"—মায়ের মৃত্যুর পর বাবা আমার প্রতি স্নেহ আদরে তাঁহার স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, "তা কি হয়, আমি কিছু করিব।"

কিন্তু কিছুই করা হয় না। পিসিমা, দিদি, বৌদিদি (আমার মামাতো ভায়ের স্ত্রী, আমাদের বাড়ীতেই থাকিতেন) আমাকে বিব্রত করিয়া তুলিলেন; কোথায় কোন্ সুন্দরী মেয়ে আছে তাহাদের লম্বা

তালিকা আমার কাছে পছন্দ করিবার জন্য ক্রমাগতঃ পেশ হইতে লাগিল। নাম দেখিয়া পছন্দ করিতে হইলে অনেকগুলিই করিতে হয়, সুতরাং একটাও পছন্দ করিলাম না। পিসিমা ও দিদি রাগ করিয়া, ভ্রাতৃ-জায়া অভিমান করিয়া অস্থির। কি করিব ভাবিতেছি, সহসা একদিন কলেরা একটা উদ্দাম ঘূর্ণাবর্ত্তের মত আসিয়া আমার বাবার দেহমুক্ত আত্মা শূন্যে লইয়া গেল। বাবার একমাত্র ইচ্ছাও পূর্ণ করিলাম না।

২

আমি এণ্ট্রেন্স ফেল করিয়া কলিকাতা হইতে ম্যাট্‌সিনী গ্যারিবল্‌-ডির একটা ক্ষুদ্র সংস্করণরূপে বাড়ী আসিয়াছিলাম; ভাবিয়াছিলাম পিতার অর্থেই স্বদেশহিতৈষিগণের অগ্রগণ্য হইতে পারিব। এ বাক্যযুদ্ধের যুগে যশস্বী হইতে অধিক আয়োজনের আবশ্যক করে না, কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় মাত্র; তাহার অভাব হইবে না। কিন্তু মানুষ কখন যে কথা ভাবে না, বিধাতা অনেক পূর্ব্বেই সে কথা ভাবিয়া রাখেন। তাহার পর হঠাৎ মানুষের আশা-ভঙ্গ, উৎসাহভঙ্গ হইতে দেখিয়া তাঁহার সর্ব্বদর্শী দেবনেত্র হইতে সহানু-ভূতির অশ্রু বিগলিত হয় কি না, তাহা তিনি ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারে না। সমস্ত আশা মরুভূমির মরীচিকার মত একদিন সহসা শূন্যে মিলাইয়া গেল। বাবা যে সাহেব-জমীদারের দেওয়ানের অধীনে কর্ম্ম করিতেন, তিনি আমার নামে বর্দ্ধমানের সবজজ আদালতে বিশহাজার টাকার দাবীতে এক নালিশ রুজু করিলেন। বাবা রাণীগঞ্জে একটা কয়লার কারবার খুলি-বার জন্য এ টাকা নাকি দেওয়ানজীর নিকট কর্জ্জ লইয়াছিলেন; আমি ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতাম না। একদিন সকাল বেলা সুখসুপ্তি ভঙ্গে জানিতে পারিলাম, ঘর, বাড়ী বাগান, জমীজমা সমস্ত রেহানে আবদ্ধ,

মর্টগেজ ডিড্ রেজেষ্ট্রী করা। দেখিলাম, মকর্দ্দমা করা অনর্থক; সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া, নগদ টাকা যাহা ঘরে ছিল তাহা সমস্তই বাহির করিয়া সুদসমেত সমস্ত দেনা শোধ করিলাম, বাস্তু ভিটাখানি অতি কষ্টে উত্তমর্ণের গ্রাস হইতে অব্যাহত রহিল। আমার বাল্যবন্ধু নব্য উকীল বিচক্ষণ সব্যসাচী বাবু আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "তুমি কি বোকা! মকর্দ্দমা কোরলে হাইকোর্ট পর্য্যন্ত ত দেখা যেত। চেষ্টা না ক'রে কে এ ভাবে সর্ব্বস্ব নষ্ট করে! আমরা আছি কেন?"—আমি সব্যসাচীকে উত্তমরূপ চিনিতাম; বলিলাম "ভাই তোমাদের বিলক্ষণ চিনি। যে টাকাটা দিয়া দেনা শোধ করিলাম, মামলা করিলে সে টাকাটা তোমরা পাঁচজন সুহৃদেই ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়া লইতে; তাহার পর দেনা শোধ করিতাম কি দিয়া? পথে দাঁড়াইলেও ত কোন উপায় হইত না।"

তাহার পর দেখিলাম, চতুর্দ্দিক অন্ধকার। গ্রামের বিজ্ঞ মহোদয়েরা বলিতে লাগিলেন "ছোঁড়াটা একেবারে অপদার্থ; সর্ব্বস্ব ঘুচুলে"। পিসিমার মুখে শুনি, স্নানের ঘাটে মেয়েরা বলাবলি করে সংসারটা আমিই ছারেখারে দিলাম। বিশবৎসর তখন আমার বয়স, জগতের চারিদিকে কত উৎসাহ, কত আনন্দ, সংসার রঙ্গমঞ্চে তখন আমার সুখময় জীবন-নাটকের অভিনয়ারম্ভের সময়, সুদূর স্বপ্নলোক পর্য্যন্ত আমার কল্পনা-জাল বিস্তৃত, আকাশব্যাপী আমার আশা আকাঙ্ক্ষা;—আর আমি কি না পদে পদে অবজ্ঞাত, বিড়ম্বিত, লাঞ্ছিত হইতে লাগিলাম; শেষে পরিবার প্রতিপালন করাও আমার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। একদিন পিসিমা বলিলেন, ঘরে চাল নাই, একটা পয়সাও নাই। আমি কোন উত্তর দিলাম না, মুখে কথা বাহির না হইয়া চক্ষু দিয়া কতকগুলা অনাবশ্যক অশ্রু বাহির হইয়া পড়িল। কাপুরুষ আমি,—আমি বাঁচিয়া থাকিতে আমার পিসিমা ও ভগিনী উপবাসে

দিন কাটাইবে! বাবা আমাকে একটা সোণার অঙ্গুরী দিয়াছিলেন, সেটি স্বর্ণকারের দোকানে বিক্রয় করিয়া পঁয়ত্রিশ টাকা পাইলাম,—পিসিমার হাতে কুড়ি টাকা দিয়া অবশিষ্ট পনর টাকা লইয়া বর্দ্ধমানে যাত্রা করিলাম।

বিশবৎসর বয়সে চাকরীর জন্য এই প্রথম আমি সংসার-সাগরের ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে আপনাকে নিক্ষেপ করিলাম। কিছুকালের জন্য মগরার সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে হইল।

৩

বর্দ্ধমানে পিতার একজন বন্ধু ছিলেন, তাঁহার নাম যোগেন বাবু। যোগেন বাবু আমাদের অবস্থা-পরিবর্ত্তনের কথা কতক শুনিয়াছিলেন; তিনি আমার প্রকৃত হিতৈষী ছিলেন। মৌখিক সহানুভূতি ও উপদেশের দীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা কোন দিন তিনি আমাকে অনুগৃহীত করেন নাই। যোগেনবাবু আমার চাকরির জন্য চারিদিকে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বাঙ্গলাদেশে চাকরী ত একেই অতি দুর্লভ; তাহার উপর আমার বিদ্যার সীমা ছিল না, সুতরাং যোগেন বাবুর চেষ্টা সফল হইতে কিছু বিলম্ব হইল। অবশেষে পঁচিশ টাকা বেতনে একটা মাইনর স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টারী মিলিল; যোগেন্দ্র বাবুর বন্ধু নরেন্দ্র বাবু এই স্কুলের সেক্রেটারী। পঁচিশ টাকায় নিজেই বা কি খাইব, বাড়ীতেই বা কি পাঠাইব?—নরেন্দ্রবাবুর দয়ার শরীর, তিনি আমার ভার গ্রহণ করিতে চাহিলেন। অনেক সহিয়াছি, এবার আমি তাঁহার গলগ্রহ হইতে অস্বীকার করিলাম; শেষে স্থির হইল, তাঁহার ছেলে দুটিকে তিনি লেখাপড়া শিখাইবার ভার আমার হস্তে প্রদান করিবেন, আমাকে গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হইবে না।

কোন রকম করিয়া সংসার চলিতে লাগিল। পূর্ব্বে সুখে চলিয়াছিল, এখন দুঃখে চলিতে লাগিল। কাহার দিন পড়িয়া থাকে? আমাদেরও দিন পড়িয়া রহিল না। নিজের কাজ লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতাম, ছেলে দুটিকে বাড়ীতে মনোযোগ সহকারে পড়াইতাম, কোন কোন শনিবারে বাড়ী যাইতাম। পিসিমার স্নেহে, দিদির অকৃত্রিম যত্নে বাড়ীতে সপ্তাহের ছুটির দিন ক্ষণস্থায়ী সুখস্বপ্নের ন্যায় অতিবাহিত হইত। এইভাবে এক বৎসর কাটিয়া গেল।

মনের মধ্যে কি একটা অতৃপ্তি গাঁথা থাকিত, তাহার কোন কারণ খুঁজিয়া পাইতাম না। এক একদিন স্কুলের ছুটী হওয়ার পর বাসায় আসিয়া আমার শয়ন-কক্ষটীতে একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া বদ্ধদৃষ্টিতে দূর পথের দিকে চাহিয়া থাকিতাম। আমাদের বাসা গ্রামের এক প্রান্তে; তাহার পরই একটা মাঠ; মাঠের ভিতর দিয়া একটা ইষ্টকবদ্ধ পথ চলিয়া গিয়াছে; দুই পাশে অশ্বত্থ, ঝাউ গাছের সারি; অপরাহ্নের সূর্য্যকিরণে গাছের ছায়া প্রান্তরবক্ষে বিলম্বিত হইত, অশ্বত্থশাখার শ্যামল পত্রের মধ্যে বসিয়া নানাজাতীয় পাখী হর্ষকাকলী আরম্ভ করিত, বায়ু-কম্পিত ঝাউশীর্ষ হইতে শর শর শব্দ উঠিতে থাকিত, ঠিক তাহা আমার আকুল দীর্ঘশ্বাসের অনুরূপ। বাল্যজীবনে কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা ছিল, সহস্র আকাশকুসুম কল্পনানেত্রের সম্মুখে প্রতিদিন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিত; দেশের উন্নতি, সমাজের সংস্কার, জীবনের সফলতা—সকল আশা সন্ধ্যার আলোক-রেখার ন্যায় একে একে আমার এই অকর্ম্মণ্য জীবন হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। এখন চারিদিক অন্ধকার! কে জানিত পঁচিশ টাকা মূল্যের মাইনর স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টারী আমার জীবনের অদ্বিতীয় সম্বল হইবে! হেমবাবুর সেই দুইটি

লাইন আমার নিরাশদগ্ধ ব্যর্থ হৃদয়ের মধ্যে পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হইত ;—

“ছিন্ন তুষারের ন্যায়, বাল্যবাঞ্ছা দূরে যায়,
তাপদগ্ধ জীবনের ঝঞ্ঝাবায়ু-প্রহারে।
পড়ে থাকে দূরগত জীর্ণ অভিলাষ যত
ছিন্ন পতাকার মত ভগ্ন দুর্গ-প্রাকারে।”

তাই বুঝি ঝাউর সেই অর্থহীন মর্ম্মর শব্দ, অপরাহ্নের দীপ্তিহীন সূর্য্যালোক এবং কর্ম্মশ্রান্ত দিবসের শিথিল মিশ্রকোলাহল আমার কাছে এত ভাল লাগিত। আমার হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে তাহারা বেদনার রুদ্ধ-অশ্রু নয়নপ্রান্তে টানিয়া আনিত।

ইহার উপর আর এক উপসর্গ আরম্ভ হইয়াছিল। পিসিমা ধরিয়াছিলেন ‘বিবাহ কর’ ; দিদি বলিতে লাগিলেন, ‘ভাই, আমাদের শেষ আশাটাও মিটাবি নে! বাবা বৌয়ের মুখ দেখবার জন্য ব্যাকুল হইয়া মরিয়াছেন।’ বৌ-দিদির গঞ্জনা,—সে কথা আর কি বলিব,—“গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকম্।” এই জীবন-সমুদ্রে নিজেই হাবুডুবু খাইতেছি, কখন যে পাড়ি জমাইতে পারিব সে আশা নাই; আবার একটা বোঝা ঘাড়ে বাঁধিব ? নিজে ডুবিব তাহাকেও ডুবাইব ? নিজের অক্ষমতার ক্ষমা আছে, কিন্তু যে নিজের অক্ষমতা অন্যের অবলম্বন-দণ্ডস্বরূপে ব্যবহার করিতে যায় তাহার মার্জ্জনা নাই।

মানুষ যাহা ভাবে, তাহা করিতে পারে না, অনেক সময় ঠিক উল্‌টা করিয়া বসে, ইহাই অদৃষ্ট বা বিধিলিপি। পিসিমা আমাকে মানুষ করিয়াছিলেন ; মার নিকট আমি যতদূর ঋণী, পিসিমার নিকট তাহা অপেক্ষা কম ছিলাম না। পৃথিবীতে আমার কিছুই ছিল না, সকলই হারাইয়া

বসিয়াছিলাম, কেবল এক কৌলীন্য গর্ব্ব ছিল,—আমরা মহাকুলীন। হরিরামপুরের সর্ব্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় আসিয়া পিসিমার পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িলেন, আমি তাঁহার কন্যাকে বিবাহ না করিলে তাঁহার জাতি রক্ষা হয় না। আমার সম্মতির অপেক্ষামাত্র না করিয়া পিসিমা মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে কথা দিলেন, "তোমার জাতি রক্ষা যাহাতে হয় তাহা করিব।"

আমি এ সকল কথার কিছুই জানিতাম না। চৈত্রমাসের একদিন শনিবারে বাড়ী আসিলাম। দিদি ভাত দিয়া দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আছেন, আমি আহার করিতে বসিয়াছি, পিসিমা কাছে বসিয়া বাতাস করিতে করিতে কথায় কথায় বলিলেন, "বাবা গিরিশ, আমি তোর কাছে কখন কিছু ভিক্ষা চাইনি। আর বেশী দিন বাঁচব না, আমাকে একটা ভিক্ষা দিবি?"—আমি মুখ তুলিয়া বলিলাম, "তুমি এ কি কথা বল পিসিমা, আমার কাছে কি ভিক্ষা চাও?—তুমি আমাকে মানুষ করেছ, তোমার স্নেহে আমি কোন দিন মায়ের অভাব জানতে পারি নাই, তুমি যে হুকুম করবে আমার সাধ্য হলে তাই পালন করব।"

পিসিমা বলিলেন, "হরিরামপুরের সর্ব্বেশ্বর মুখুয্যের মেয়ে, যেমন রূপ, তেমনি গুণ, চোদ্দ হতে এই পনরয় পা দিয়েছে। সেবার গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে দেখে এসেছি; ওদের সঙ্গে আমার শ্বশুরদের একটু সম্বন্ধও আছে। সর্ব্বেশ্বর আমার কাছে এসে কেঁদে পড়েছিল, বলে, তুই যদি লক্ষ্মীকে বিবাহ না করিস্ ত ব্রাহ্মণের জাত যায়। আমি তাকে কথা দিয়েছি, তোকে এই মেয়ে বিয়ে করতেই হবে। বুড়ীর মুখ রাখ, ব্রাহ্মণের জাত বাঁচা। এ ত অকর্ম্ম নয় বাবা; এই বৈশাখের দশই আর ছাব্বিশে ভাল দিন আছে।"

আমি আকাশ হইতে পড়িলাম। কোন কথা না বলিয়া পিসিমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম, ভাতের গ্রাস মুখে উঠিল না।

পিসিমা কাতরস্বরে বলিলেন, "এই দেখ্ বুড়ো হয়েছি, বড় জোর আর দুবৎসর বাঁচব, আমার শেষ সাধ পূর্ণ করবি নে? একটা ভিক্ষা তোর কাছে চাইলাম, পাব না? বিয়ে করা কি এতই শক্ত কাজ বাবা?"

আমি বলিলাম, "শক্ত কে বলে? খুব সহজ, নতুবা এ হতভাগা দেশে যার একসন্ধ্যা আহার জোটে না, তারও বিবাহের কনের অভাব হয় না কেন? কিন্তু পিসিমা, পরিবার প্রতিপালন বড় কঠিন কাজ; কোন রকমে আমাদের সংসার চল্‌ছে, তার উপর আবার ভার বাড়ালে কেমন করে চলবে?"

পিসিমার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া উঠিল; রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "শেষ ভিক্ষা চাইলাম, তাও দিলি নে। ঈশ্বর তোর মঙ্গল করুন, কিন্তু আমি আর তোর সংসারে থাকব না; আজ যদি তোর মা এমনি করে কেঁদে তোকে ধরত, তার চোখের জল এমন ভাবে অগ্রাহ্য করতে কি তোর সাহস হত?"

আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না; পিসিমার এ অভিমান তাঁহার উদার বিধবা-হৃদয়ের উন্মুক্ত স্নেহেরই উপযুক্ত; বলিলাম, "কাল জবাব দিব। তুমি আক্ষেপ করো না।"—রাত্রে আর আমার ভাল করিয়া খাওয়া হইল না।

সমস্ত রাত্রি চিন্তা করিলাম, কত আকাশ পাতাল চিন্তা! বিবাহ করিব,—করিয়া কি সুখী হইব? আমার সঙ্গীহীন একক জীবনটাতে আমি বেশ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি। প্রেমের মোহ কি জানি না, কখন তাহাতে মুগ্ধ হই নাই, কিন্তু এরূপ বিবাহে সুখের আশা বিড়ম্বনা মাত্র,

তাহা বুঝি। প্রেমহীন হৃদয় লইয়া কি বিবাহ করা যায় ? একাকী আসিয়াছি, একাকী যাইব ; জলস্রোতের মত জীবনের এতগুলা বৎসর কাটাইয়া দিলাম, আর কয়েক বৎসর কাটিলেই ত সংসারের দোকানপাট তুলিতে হইবে।

কিন্তু পিসিমা মনে বড় ব্যথা পাইয়াছেন, দিদি ত অভিমান করিয়া আর আমাকে বিবাহের কথাই বলেন না, বৌদিদি বলেন, "আমি পর বই ত নই, আমার কথা কেন রাখিবে !"

ভাবিলাম, সকলের প্রীতির জন্য এ হৃদয় বলি দিব। পৃথিবীতে কোন সৎ, কোন মহৎ কাজ করি নাই ; কাহারও মনে কোন আনন্দ দান করিতে পারি নাই ; পিসিমার শেষ বাসনা অপূর্ণ রাখিব না, বিবাহ করিব। সুখী হইব না নিশ্চয়, এমন হতভাগ্য দরিদ্র অক্ষম কি বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারে ?

পরদিন পিসিমাকে বলিলাম, "বিবাহ স্থির কর, তোমার আদেশ পালন করিব ; কিন্তু আমার দুঃখ তোমরা জমাট বাঁধিয়া তুলিলে।"

বৌদিদি বলিলেন, "মেয়ে দেখ্‌বে না, ঠাকুরপো !"

আমি নিরাশার হাসি হাসিয়া উত্তর করিলাম, "যাহারা সুখের জন্য বিবাহ করে তাহারা মেয়ে দেখুক ; তোমরা যাহাতে সুখী হও তাহাই যখন করিতেছি, তখন মেয়ে দেখিবার আবশ্যক কি !"

বৌদিদি চক্ষে বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো যেন কি ?—আচ্ছা দেখা যাবে !"

৪

বৈশাখ মাসের প্রথমেই আমার বিবাহ হইয়া গেল। আমার স্ত্রীর নাম

লক্ষ্মী। শুভদৃষ্টির সময় একবার লক্ষ্মীর মুখ দেখিয়াছিলাম; সেই সুন্দর সরল মুখে এমন একটা বিষাদের ভাব ছিল যে, আমি বালিকার হৃদয়-রহস্য জানিবার জন্য ব্যাকুল হইলাম; কিন্তু সে ব্যাকুলতা প্রকাশ করি নাই। বিবাহ করিবার পূর্ব্বে কিছু না ভাবিয়া চিন্তিয়া, কনে না দেখিয়া, একটা পাড়াগেঁয়ে অসভ্য মেয়ে বিবাহ করিয়া আনিব, ইহা কোন দিন আমি ভাবি নাই। মনের মধ্যে স্ত্রীর আদর্শ অতি উচ্চ ছিল; ভাবিতাম মৃণালিনী, কুন্দনন্দিনীর মত প্রেমবিহ্বলা, পতিগতপ্রাণা পত্নী যদি কখন পাই, তবে তাহাকে বিবাহ করিব। অনেক সময়ে আমি নিজের দুরবস্থায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতাম; জগতের এত সুন্দর দৃশ্যের মধ্যেও তৃপ্তি পাইতাম না; বিবাহের রাত্রে বুঝিলাম, আমার ইচ্ছা পূর্ণ না হইবার সম্ভাবনাই তাহার অন্যতম কারণ; এতদিন তাহা বুঝি নাই। যদি আমি দরিদ্র না হইতাম! নিজের ইচ্ছা যখন পূর্ণ হইবে না তখন পিসিমার ইচ্ছাই পূর্ণ করি; মনে জানিব একজনকে সুখী করিলাম। তাই এ বিবাহে মত দিয়াছিলাম; কিন্তু আর একজনকে যে অসুখী করিবার আমার কোন অধিকার নাই, স্বার্থত্যাগের গর্ব্বে আমি সে কথা একবারও ভাবি নাই; ভাবিলে কি বিবাহে সম্মতি দান করি?—এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে জীবনের শুভবন্ধন-বিধায়ক পুণ্যময় বাসরযামিনী অতিবাহিত করিলাম। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া দেখি লক্ষ্মী একপাশে শুইয়া ঘুমাইতেছে, তাহার মুখের উপর হইতে অবগুণ্ঠন সরিয়া পড়িয়াছে, বাতায়ন-পথে পাণ্ডুর চন্দ্র ম্লান দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে এবং প্রভাত-বায়ু তাহার সিন্দূরবিন্দু-প্রান্তবর্ত্তী কুন্তলরাশি কম্পিত করিতেছে। আমি একবার লক্ষ্মীর মুখের দিকে চাহিলাম, সে মুখ কোমলতা ও সরলতায় প্রভাত মল্লিকার শিশিরস্নাত সুরভিত দলের ন্যায় বিকশিত

হইয়া শোভা পাইতেছে। মনে হইল, ইহাকে চিরজীবনের জন্য দুঃখের পাথারে ভাসাইলাম! সহসা রোশুনচৌকী সেই প্রভাত সমীরণ প্লাবিত করিয়া নববৈশাখের উজ্জ্বল মধুর প্রকৃতির প্রিয় সম্ভাষণের ন্যায় কোমল-কণ্ঠে গাহিয়া উঠিল,—

"হাসি পায় হে, পায়ে ধরা দিন পড়্‌লে মনে।"

আমি একটু হাসিয়া বাহিরে আসিলাম।

শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে সেই প্রথম সম্বন্ধ। বাড়ী আসিয়া অষ্টমঙ্গলায় আর শ্বশুরবাড়ী ফিরিলাম না; শ্বশুরমহাশয় লক্ষ্মীকে লইয়া গেলেন, আমি চাকরী করিতে চলিলাম। দুদিন পরে কাশী বাবুর সঙ্গে দেখা। তিনি বলিলেন, "কিহে কদিন দেখিনি যে, বাড়ী গিয়েছিলে বুঝি! কেন?—" আমি বলিলাম, "হাঁ, একটা শ্রাদ্ধ ছিল,"—কাশী বাবু উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রাদ্ধ—কার!" আমি অবিচলভাবে উত্তর দিলাম, "আমার এবং আর একজনের।"—কাশী বাবুর কিছু বয়স হইয়াছিল, মুরুব্বিয়ানা স্বরে হাসিয়া বলিলেন, "হা, হা, ইয়ং বেঙ্গল কিনা, বিয়ের আগে বুঝি কোর্টসিপ হয় নি, তাই স্ত্রী অপছন্দ হয়েছে? তা ও রোগ শীঘ্রই সারবে, অনেকেরই এ রকম হয়।"—আমার জিদ পড়িয়া গেল, স্থির করিলাম, একটা আদর্শ রাখিতে হইবে; এ স্ত্রীর কথা জীবনে মুখে আনিব না।

স্ত্রীর কথা আর মুখে আনিতাম না বটে, কিন্তু মনেও কি আনিতাম না? তাহা অন্তর্যামী জানেন; এক এক সময়ে মনে হইত স্ত্রীর হৃদয় কত উচ্চ, প্রেমপূর্ণ, সহৃদয়তা ভরা, তাহা এ জীবনে আর জানা হইল না; ইহা জীবনের একটি অল্প অভাব নহে; আমি এত হতভাগ্য যে, তাহা হইতেও বঞ্চিত হইলাম! কিন্তু সে কি আমার দোষ? ধিক্ প্রতিজ্ঞা-

পালন, কেন বিবাহে সম্মত হইয়াছিলাম ? মনে এক একবার অনুতাপের উদয় হইত। হৃদয়ের দুর্ব্বলতায় আবার লজ্জিত হইতাম।

জ্যৈষ্ঠমাসে গ্রীষ্মের ছুটীতে বাড়ী গিয়াছি ; পিসিমা বলিলেন, "বা'বা গিরিশ, তোর শ্বশুরবাড়ী থেকে লোক এসে বসে থাক্‌লো, যাবি কবে ?"

হৃদয়ের দম্ভ সহসা বিদূরীত হয় না, আমি বলিলাম, "যাব কে বল্লে ?"

পিসিমা সবিস্ময়ে বলিলেন, "সে কি, যাবি নে ?"

আমি পিসিমাকে বেশী বিস্মিত করিয়া বলিলাম—"বিবাহ করবার সময় শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার ত কোন কথা ছিল না।"—পিসিমা গণ্ডস্থলে করস্পর্শপূর্ব্বক নির্ব্বাক্ রহিলেন।

দিদি বলিলেন, "বৌ আন্‌তে হবে কবে ?"

আমি বলিলাম, "সে তোমরা জান, কিন্তু আমাকে যদি মধ্যে মধ্যে বাড়ী আস্‌তে দিতে তোমাদের আপত্তি থাকে, তবেই তাকে এনো, আমি একা বেশ আছি।"

দিদি ও পিসিমা একটু কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলে, ধীরে ধীরে জানালার অপর পাশ হইতে কে বলিল, "সে লোকটা কেমন আছে, সে কথাও ত একবার ভাব্‌তে হয়—পুরুষের বড় দয়ার শরীর!" চাহিয়া দেখিলাম বৌদিদির প্রস্ফুটিত মুখপদ্ম ; সে পদ্ম হইতে কোন দিন মধুবর্ষণ হইল না, কিন্তু কণ্টকাঘাতে জীবন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

এমনি ভাবে তিন বৎসর কাটিল ; লিখি পড়ি, মনে শান্তি পাই না। আমার বিরহে কেহ যে কোথাও পদ্মপত্র ব্যজনে গাত্রদাহ নিবারণ করিতেছে, কিম্বা দিস্তা দিস্তা কাগজ ভরিয়া কবিতা লিখিতেছে, অথবা ভগ্নহৃদে 'সারা রজনীর গাঁথা ফুলমালা প্রভাতের চরণে' ঢালিয়া দিতেছে, সে আশঙ্কা একটুও ছিল না। তবে একটা কথা মনে হইত, চিরদিন

ত উদ্দাম মনোবৃত্তির স্রোতেই ভাসিয়া চলিয়াছি, কোথাও কূল পাই নাই, কূলে উঠিবার একবার চেষ্টা করিয়া দেখি না! আমি কি তাহাকে মানুষ করিয়া লইতে পারি না? বিপদে পরামর্শদাত্রী, সম্পদে লক্ষ্মী, রোগে মূর্ত্তিমতী করুণা, শোকে চিরসান্ত্বনার আধার, নিজে এরূপ ভাবে গঠিত করিয়া না লইলে স্ত্রীর হৃদয় কিরূপে শিক্ষিত হইবে? যদি আমার চরিত্রের কিছু গুণ থাকে, তাহা হইলে তাহাকে আমার উপযুক্ত স্ত্রী করিয়া লইব। শুভবুদ্ধিটা হঠাৎ এক এক সময় মাথার মধ্যে আসে, কিন্তু অনেক সময় নষ্ট করিয়া আসিলে, নিজের নির্ব্বুদ্ধির উপর বড়ই রাগ হয়। স্থির করিলাম, লক্ষ্মীকে কাছে আনিব; তবে একটা কথা,—পিসিমা, দিদি সেই বাক্যকণ্টকজ্বালাদায়িনী বৌদিদি আমার বিচিত্র ব্যবহারে কি মনে করিবেন?

একটা বাসা ঠিক করিয়া লক্ষ্মীকে আনিলাম। আমার শুভ মতি দেখিয়া নরেন্দ্র বাবু একদিন বলিলেন, 'গিরিশ, বৌমাকে এনেছ, দেখো ওঁর যেন কষ্ট না হয়। তুমি ত আর আমাদের বাড়ী থাকতে পারবে না, আমি ছোঁড়াদের টিউসনির জন্য তোমাকে মাসে পনর টাকা ক'রে দেব। এতে ওতে এক রকমে চলে যাবে, কেমন?"

এখানে আমাদের দম্পতি-জীবন অসুখে কাটে নাই। পূর্ব্বকার কবিত্ব মনে করিয়া বড় সঙ্কোচ বোধ হইত, মনে হইত কি ছেলেমি করিয়াই জীবনের দীর্ঘ তিনটা বৎসর মনের দুঃখে কাটাইয়াছি।

একদিন লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বিবাহের রাত্রের কথা তোমার মনে আছে? মুখ বড় ভার দেখিয়াছিলাম; কেন বলিতে হইবে?"

লক্ষ্মী দ্বারে ঠেস দিয়া নতদেহে দাঁড়াইয়া বামপদের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে মাটি খুঁড়িতে লাগিল।

আমি আবার বলিলাম, "লক্ষ্মী, বল।"

অনেক কষ্টে, অনেক চেষ্টার পর আমার সহিত প্রাণ খুলিয়া কথা বলিবার এই তাহার প্রথম চেষ্টা!—লক্ষ্মী অধোবদনে বলিল, "আমি নেত্য পিসিমার কাছে শুনেছিলাম আমাকে তোমার বিয়ে কর্‌তে ইচ্ছে নেই, এ কথা তুমি অনেক আগেই বাড়ীতে বলেছিলে।"

কথাটা অস্বীকার করিতে পারিলাম না। শেষে নিজের পক্ষ সমর্থনের জন্য অনেক অসার কথা বলিয়া ফেলিলাম, রোশুনচৌকীর গানের কথাটাও তাহাকে বলিলাম। লক্ষ্মী কথায় কথায় আমার কাছে আসিয়া বসিয়াছিল, এবার আমার স্কন্ধে মস্তক ন্যস্ত করিয়া বলিল, "ভালবাস আর নাই বাস, আমি তোমার।" তাহার চক্ষুপ্রান্ত হইতে দুইটী মুক্তাবিন্দু আমার বক্ষে গড়াইয়া পড়িল,—ইহা সুখের না অভিমানের অশ্রু?

পূজার সময় বাড়ী আসিতে হইল। পথে ভাবনা হইল পিসিমাকে মুখ দেখাইব কি করিয়া? কিন্তু পোড়া মুখ দেখাইতে হইল। পিসিমা বউকে সযত্নে ঘরে তুলিয়া লইলেন, বৃদ্ধার চক্ষু দিয়া আনন্দের ধারা বহিতে লাগিল; কি অতুলনীয় স্নেহ! আমার উপর অভিমান করিবার তাঁহার অবসর হইল না, বলিলেন, 'গিরিশ, আজ তুই আমার ছেলের মত কাজ করিয়াছিস; আহা, বউমার মুখখানি একেবারে শুকিয়ে গেছে।"

আমি রাগ করিয়া বলিলাম, "হ্যাঁ গ্যাছে, এই টুকু পথ আস্‌তে আবার মুখ শুকোয়!"

বউদিদি দেখি একেবারে সর্ব্বব্যাপিনী, একটা কথা যদি তাঁহার জ্বালায় বলিতে পারিব! তিনি বলিলেন, "হ্যাগো, হ্যাঁ জানা গেছে সব। কথায় বলে, 'যখন তোমার কেউ ছিল না, তখন ছিলাম আমি, এখন তোমার সব হয়েছে পর হয়েছি আমি।"

"যারা পর হয়েছে তাদের সঙ্গে আমার বাক্যালাপ বন্ধ।"—অতি স্বাভাবিক স্বরে উত্তর করিয়া আমি ঘরে উঠিলাম।

তাহার পর হইতে আমি যখন যেথানে থাকিতাম লক্ষ্মী সর্ব্বত্র আমার সঙ্গিনী। লক্ষ্মী তাহার ভ্রাতার বিবাহে একবার বাপের বাড়ী গিয়াছিল, আমি যথারীতি সঙ্গে। বড় শালাজ মহাশয়া রসিকতায় বউদিদির অপেক্ষা অনেক গুণে স্থূল, বলিলেন, "বাঁড়ুয্যে কি গাড়ুগামছা ব'য়ে এসেছ ? তা ছোট্ট ঠাকুরঝির নাপিতটি মিলেছে ভাল।"

আমি বলিলাম, "আপনাদের মত কোমল চরণে আল্‌তা পরানোর সৌভাগ্য এ সকল নাপিতের নেই ; সে কাজ বড় বড় নাপিতের।"—উত্তরটা কিছু তীক্ষ্ণ হইয়াছিল ; কিন্তু বড়ই বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল যে !

* * * * *

এই ভাবে তিন বৎসর একত্র কাটিল। কত নিদ্রাহীন পূর্ণিমা রাত্রে মুগ্ধ পূর্ণচন্দ্র আমাদের বিচ্ছেদবিহীন দেহ কৌমুদীমগ্ন করিয়া অস্ত গিয়াছে, কত মেঘমণ্ডিত অমানিশায় মুষলধারে বৃষ্টি ও ঝটিকার শব্দে এবং বজ্রনাদে আতঙ্ক-কম্পিতা লক্ষ্মীর হৃদয়-স্পন্দন আমার উত্তপ্তবক্ষে অনুভব করিয়াছি !—তাহার পর, তাহার পর যাহা ঘটিল—এখন তাহাই বলিব।

জ্যৈষ্ঠ মাসে আমার এক জ্ঞাতি দাদার মেয়ের বিবাহ। আমার দাদা অন্যত্র দারোগাগিরি করিতেন, তাঁহার সঙ্গে আমার বড় সাক্ষাৎ হইত না, তিনি কোন খবরও লইতেন না। পাশের বাড়ী, একবাড়ী বলিলেই হয়। বিবাহের দুইদিন আগে তিনি আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত, "পাতানীর বর ঠিক করিয়াছি।—পরশু বিবাহ। তুমি আজই বাড়ী চল।" দাদার মুখে এই হুকুম শুনিলাম।

আমি বলিলাম "আপনি আজ বাড়ী যান, আমি কা'ল যাইব।"

বিবাহের পরদিন গ্রীষ্মাবকাশের জন্য স্কুল বন্ধ হইবে, সে দিন স্কুলে উপস্থিত থাকাই চাই।

স্কুলের সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করিলাম। তিনি বলিলেন, "শনিবারে তোমাদের স্কুল বন্ধ, কাল বিবাহ দিয়া পরশ্বই চলিয়া আসিবে, শনিবারে কামাই করা উচিত হইবে না, সেটা ছুটীর আরম্ভ দিন। একেই লোকে বলে আমি তোমার পক্ষপাতী।"

আমি তাহাই শিরোধার্য্য করিয়া 'পাতানীর' বিবাহ দিতে চলিলাম, তখনো সঙ্গে 'সেই সব সুখ-দুঃখ-মন্থন-ধন,' লক্ষ্মী!

নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ হইয়া গেল। শুক্রবার রাত্রে বিবাহ হইল, লোকজন খাওয়াইতে রাত্রি শেষ হইয়া গেল। রাত্রে ঘুমাইবার অবসর ছিল না; সকল লোকের আহারাদি শেষ হইলে আমি বরযাত্রিদের মধ্যে পড়িয়া একটু গড়াগড়ি দিলাম। তাহার পর উঠিয়া দেখি ভোর হইয়াছে, আর ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে ট্রেণ, আমি বাড়ীর মধ্যে যাইতেই দেখি বারান্দায় লক্ষ্মী, আমার জন্য গরম ভাত চড়াইয়াছে।

দেখিলাম তখন নির্ব্বিঘ্নে কথা বলা যাইতে পারে। বলিলাম, "লক্ষ্মী, তুমি এত সকালে কি কোরছো?—তুমি একটু শোওনি কি?"

লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল, "সময় কোথায়? সংসার সারিতেই রাত পোহা-ইয়া গেল। এখন যাইবার উদ্যোগ করিতেছি, তোমাকে ত দুটী খাইতে হইবে। না খাইয়া গেলে তোমার এ বেলা খাওয়া হইবে না। আমিও যাবো।"

"সেকি কথা! তুমি থাক।"

"না।"

আমি বলিলাম "এ তোমার নিতান্ত বাড়াবাড়ি। দেখ দেখি, আজ

হ'ল বাসি বিয়ে ; বাড়ীতে একদল কুটুম্ব, আমি তোমাকে কি ক'রে এর মধ্যে হতে নিয়ে যাই, আর লোকেই বা কি বলে ?”

লক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া বলিল, “যাও গো যাও ; আমি তোমাকে বেঁধে রাখছিনে, একা অনেক দিন চলেছে ত।”

আমি বলিলাম, “অচল তোমার চেয়ে আমারই বেশী হোয়েছিল।”

লক্ষ্মী বলিল, “আজ তোমাদের ছুটী ; দশটার গাড়ীতে কিন্তু ফিরে আসতে চাও। আজ ত তোমাদের মর্ণিং স্কুল। হাজিরা দিলেই হোল, কাজ হোক আর নাই হোক। যে মিন্‌সেরা এমন নিয়ম করে তাদের মাথায় বজ্রাঘাত হয় না !”

প্রভাতে এই শুভ কামনা করিয়া লক্ষ্মী আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করিল, “কেমন, আসবে ত ?”

আমি বলিলাম, “আর যদি না আসি !”

“আমি—মরবো।”—আমি দুই হাতে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিলাম, বলিলাম, “রাক্ষসী, তুমি যা খুসি কেন বল্‌বে ?”

আমার হাত সরাইয়া লক্ষ্মী বলিল, “তিন সত্য কর, আসবে বল !”

আমি বলিলাম, “আস্‌বো, আস্‌বো, আস্‌বো।”

বউদিদি হঠাৎ দরজার কাছে উপস্থিত ; হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ আবার কিসের পালা ?”

আমি বলিলাম, “মানভঞ্জন।”

সাতটার সময় স্কুলে হাজির হইয়া আটটার পর ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিব ; নটায় আমার গাড়ী। সেক্রেটারী মহাশয় হেড মাষ্টারকে দিয়া মধ্যাহ্নকালে তাঁহার গৃহে প্রীতি-ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন।

কি সর্ব্বনাশ! আমি দশটার গাড়ীতে বাড়ী ফিরিব, লক্ষ্মীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি। সেক্রেটারীকে অনুগ্রহ করিয়া ছাড়িয়া দিবার জন্য ধরিলাম; বলিলাম, আমি বাড়ী ফিরিয়া বিবাহ বিদায় করিব, থাকিতে পারিব না। তিনি বলিলেন, "আঃ, তাও কি হয়, তা যাওয়া হবে টবে না; সন্ধ্যার গাড়ীতে যাবে।" অগত্যা আমি নতমস্তকে স্বীকার করিলাম,—নরেন্দ্রবাবু আমার মহা উপকারী বন্ধু।

বৈকালে বাড়ী হইতে টেলিগ্রাম পাইলাম—"বরফ ও ব্রাণ্ডি লইয়া শীঘ্র আইস।"—কি নির্ঘাত টেলিগ্রাম! বরফ ব্রাণ্ডী কি হইবে? কাহারও অসুখ হইয়াছে কি? আমার লক্ষ্মী ত ভাল আছে? সহস্র চিন্তায় আমাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম, গাড়ী আসিবার দেড়ঘণ্টা বিলম্ব।

পাঁচটার সময় আর এক টেলিগ্রাম, "কিছু আনিতে হইবে না, শীঘ্র এস।"

আমি ষ্টেশনে ছুটিলাম; এ টেলিগ্রামের ভিতর দিয়া আমি লক্ষ্মীর অমঙ্গল বার্ত্তা শুনিতে পাইতেছিলাম।

জীবনে আর কখন রেলের গাড়ীর গতি এত মন্থর বোধ হয় নাই। মগরা ষ্টেশনে আসিয়া নামিলাম। প্লাটফর্ম্মে নামিয়াই দেখিলাম আমার দুই বন্ধু, মথুর ও নবকান্ত। আমি অতি ব্যগ্রভাবে তাহাদের কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—

"মথুর, খবর কি?"

মথুর। বাড়ী চল।

"তোমরা: আমার উপর অত্যাচার করিতেছ ; আমার উদ্বেগ তোমাদের দেখাইবার নয়!"

তাহাদের সঙ্গে দুই পা অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময় বিশু খুড়ো আসিয়া আমাকে ধরিলেন ; ভগ্নকণ্ঠে বৃদ্ধ বলিলেন, "গিরিশ, আমাদের সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে। কি কলেরাই যে হোল, বাঁচাতে পারলাম না।"

আমার চক্ষুর সম্মুখে পৃথিবীর সমস্ত আলো নিবিয়া গেল। আমার মস্তিষ্ক বোধ হয় একটা উত্তপ্ত রক্তপিণ্ড মাত্র হইয়া রহিল। আমি বাঙ্-নিষ্পত্তি না করিয়া বাড়ীর দিকে কলের পুতুলের মত চলিলাম।

আমাকে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই পিসিমা কাঁদিয়া উঠিলেন, দিদি উঠানে তুলসীমূলে লক্ষ্মীর মৃতদেহের কাছে বসিয়া ছিলেন ; আমি সেথানে যাইতে তিনি আছড়াইয়া পড়িলেন, বলিলেন, "সেই রে ভাই, কেন তুই দশটার গাড়ীতে এলিনা। 'দশটার গাড়ী কি গিয়েছে ঠাকুরঝি?' এই কথা ছাড়া যে তার মুখে অন্য কথা ছিল না। তোকে একবার দেখবার জন্যে তার প্রাণটা সুস্থির হয়ে বেরুতে পারেনি।"

আমি লক্ষ্মীর মাথার কাছে বসিয়া পড়িলাম। কাঁদিব ইচ্ছা করিলাম, রোদন আসিল না ; দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া কি ভাবিতে লাগিলাম জানি না। অবশেষে যখন হৃদয় সংযত হইল, শোকের মেঘ গলিয়া অশ্রুধারায় পরিণত হইল, তখন আমি কৃতাঞ্জলিপুটে নিমীলিত নেত্রে ভগবানকে ডাকিয়া বলিলাম—

"হে অনাথনাথ, চিরমঙ্গলময় বিধাতা, তুমি আমার হৃদয়ের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া আমার জীবন শূন্যময় করিলে, এখন আমায় শান্তি দিয়া এই শূন্যতা পূর্ণ কর।"—একটা বাষ্পময় উত্তাপে হৃদয় নিপীড়িত

হইতে লাগিল। মৃতাপত্নীর লুণ্ঠিত মস্তকের কাছে বসিয়া আমি স্পন্দহীন চক্ষে সেই প্রভাহীন পাণ্ডুবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। অন্তিম উদ্বেগের শেষ চিহ্নটুকু তখনও তাহার মরণাচ্ছন্ন বিশীর্ণ অধর-প্রান্তে লাগিয়া রহিয়াছে—'দশটার গাড়ী গিয়াছে কি!'—আমি আর শুনিতে পারিলাম না, তাহার শেষ প্রার্থনাও পূর্ণ করিতে পারি নাই। আমার আশাপথ চাহিয়া সে শান্তিতে মরিতে পারে নাই, এ দুঃখ কি আমার রাখিবার স্থান আছে? কেন আসিলাম না, হায়, কেন জানিলাম না, আজ চিরবিদায় লইতেছি। সমস্ত জীবন কাঁদিয়াও এ আক্ষেপ ঘুচাইতে পারিব না।

সন্ধ্যা গভীর হইল। আত্মীয়গণ লক্ষ্মীর সুবর্ণ-প্রতিমা শ্মশানঘাটে লইয়া চলিল,—দাহ করিবে। আমার লক্ষ্মীকে দগ্ধ করিবে? শুনিলাম আমাকেই অগ্নি-সংস্কার করিতে হইবে! যে পুষ্পপুটতুল্য সুকোমল, সুন্দর পবিত্র ওষ্ঠাধর একটি মৃদু চুম্বনের লঘুস্পর্শে রক্তিম হইত, তাহাতেই আমি অগ্নিসংযোগ করিব? তাহা পারিব না, প্রভু!

শ্মশান-ঘাটে চিতা সজ্জিত হইল। ঘোর স্তব্ধ রাত্রি; দুইটি মশাল শ্মশানে জ্বলিতেছে, চারিদিকে অন্ধকার। আকাশে মেঘোদয় হইয়াছে। সহস্র শবের অস্থিতে পূর্ণ সেই অন্ধকারময় শ্মশানে মশাল দুটি মহা-কালীর প্রলয়ঙ্করী নয়নানল-শিখার ন্যায় নাচিতে লাগিল।

আমার একজন প্রতিবেশী নীরস মেঘগম্ভীর স্বরে ডাকিলেন,—"গিরিশ!"

বহুদূর হইতে জীবনের উচ্ছ্বাসশূন্য সেই দীর্ণ, কম্পিত নীরস কণ্ঠস্বর শুনিলাম। রোষাবিষ্ট দেবতার কঠোর দৈববাণীর ন্যায় তাহা নির্ম্মম, অসহনীয়; ইহা প্রলয় কালেরই উপযুক্ত কণ্ঠনাদ। আমি অনেক দূরে

চলিয়া গিয়াছিলাম, ফিরিলাম না। চলিতে লাগিলাম, দিবারাত্রি চলিতেছি, কোথায় যাইতেছি কেন যাইতেছি, জানি না। সুখ নাই, শান্তি নাই, আশা নাই, আমিই নাই। লক্ষ্মী চলিয়া গিয়াছে; লক্ষ্মী ভিন্ন আমি কে?

চলিতেছি;—বড় ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি, তবু থামিতে পারিতেছি না। থামিব কোথায়? আমার যে অবলম্বন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আমি কেবল শূন্যে ঘুরিতেছি।

আর আমার কর্ণে বাজিতেছে সেই এক কথা—মৃত্যুযন্ত্রণাতুরা অধীরা সরলা বালিকার সেই অন্তিম প্রশ্ন—'দশটার গাড়ী গিয়াছে কি?' সেই এক কথা আমি এই দশ বৎসর শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু তাহা শেষ হইল না;—আমার জীবনে তাহা শেষ হইবে না। ইহা আমার জীবনের স্মৃতি, প্রাণের সম্বল, ধমনীর স্পন্দন, অনুতাপের আগুন। দশটার গাড়ী শীঘ্রই জীবনের শেষ ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিবে। তখন এই দুঃসহ একক জীবনের সুদীর্ঘ লৌহপথের অবসানে আবার তোমার সঙ্গে সেইরূপ কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া তেমনি অবিচ্ছিন্নভাবে বাস করিব, যেমন করিয়া পৃথিবীতে তিন বৎসরকাল আমরা তিনটি সুখময়ী মধু-যামিনীর মত ক্ষেপণ করিয়াছি। পৃথিবীর দাসত্ব তখন আর আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না, আর কি তখন তোমায় ছাড়িব?

মা কোথায় ?

সরকারী কার্য্যোপলক্ষে আমাকে বঙ্গের নানা জেলায় ঘুরিতে হইত। শীত,গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরতের উপর সরকারী কার্য্যের বিরাম নির্ভর করে না। ভারতের সর্ব্বত্র এখন কল চলিতেছে, কিন্তু আমাদের মত সরকারী নফরের ন্যায় জীবন্ত কল আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কুত্রাপি দেখা যায় না; তথাপি আমরা চাকুরীর জন্য লালায়িত!

কিন্তু আক্ষেপ করিয়া ফল নাই। দাসত্ব ছাড়া অন্য কোন উপজীবিকার সহিত পরিচয় হয় নাই; সরকারী আদেশে দেশ বিদেশে দাসত্ব করিয়া বেড়াইতাম, সঙ্গে আমার বিশ্বস্ত ভৃত্য রামকুমার।

ইংরেজের বিভিন্ন মূর্ত্তি; এক মূর্ত্তিতে তিনি রাজ্যশাসন করেন, এক মূর্ত্তিতে সদাগরী করেন, এক মূর্ত্তিতে চা-কর, নীলকর। আমি সেই ইংরেজের চাকর; আমার ভৃত্যটীরও বিভিন্ন মূর্ত্তি ছিল; এক মূর্ত্তিতে সে আমার চাপরাসী, অন্য মূর্ত্তিতে খানসামা, তৃতীয় মূর্ত্তিতে পাচক।

রামকুমার আমার বহুদিনের পুরাতন ভৃত্য। যখন আমি খুলনায় কর্ম্মান্তরে নিযুক্ত ছিলাম, সেই সময় রামকুমার আমার চাকরীতে নিযুক্ত হয়। তাহার বাড়ী ঐ জেলাতেই ভৈরব নদীর তীরে; সে জাতিতে ধীবর। সংসারে আমি একাকী; আমার সংসারে আসিয়া রামকুমার পাচক-ব্রাহ্মণরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। সত্যযুগে অনেক আরাধনায় বিশ্বামিত্র যাহা লাভ করিয়াছিলেন, কলিযুগে রামকুমারকে আমি সেই ব্রাহ্মণ্য-গৌরব দান করিয়াছিলাম; রামকুমারেরও দ্বিজজ্ঞান জন্মিয়াছিল। যদি কেহ রামকুমারকে বলিত, "তুই বেটা

জেলে, তোর বাবু তোর হাতে খায় ?”—রামকুমার অম্লানবদনে উত্তর দিত, “ব্রাহ্মণের যিনি জীব দিয়াছেন, জেলেরও তিনি জীব দিয়াছেন, ব্রাহ্মণ শূদ্রের ভাতে তফাৎটা কি ?”—আমার সংস্রবেই বোধ করি তাহার এই দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়াছিল এবং এই জন্যই বোধ করি সে আমাকে দেবতা জ্ঞান করিত। বস্তুতঃ রামকুমারের মত একটী ভৃত্য না জুটিলে আমার মত অভিভাবকহীন, আত্মীয় পরিবার-শূন্য লোক এ সংসার-সাগরে হাবুডুবু খাইত।

সংসারে রামকুমারের কোন বন্ধনই ছিল না। সেই জন্যই হয় ত সে আমার নিকট অধিক করিয়া ধরা দিয়াছিল। তাহার নিকট শুনিয়াছি, বাল্যকালেই তাহার বাপের মৃত্যু হয়; সম্পত্তির মধ্যে তাহার একখানি ছোট নৌকা, আর এক কুঁড়ে ঘর ছিল। যতদিন তাহার মা বাঁচিয়া ছিল, ততদিন সে তাহার সেই পৈতৃক নৌকা লইয়া ভৈরবে মাছ ধরিত, সময় অসময়ে লোকজনও পারাপার করিত। একদিন হঠাৎ ওলাউঠা হইয়া তাহার মা মরিয়া গেল, তাহার পরও কিছু দিন সে মাছ ধরিয়াছিল; শেষে একদিন তাহার কি খেয়াল হইল, নৌকা ও বসতবাটী বিক্রয় করিয়া সে নিরুদ্দেশ হইল। শুনিয়াছি নাকি সে তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছিল। যাহা হউক, এই সংসার-সুখ-বঞ্চিত, উদাসীন, বন্ধনহীন মৎস্যজীবী যুবকের জীবনে সহসা এমন নির্ব্বেদ ভাব উপস্থিত হইল কেন, তাহার সংবাদ লইবার অবসর এবং আগ্রহ, পৃথিবীতে কাহারও হয় নাই। সে যে ছোট জাত, জেলে এবং অশিক্ষিত মূর্খ, এ কথা কোন দিন আমার মনে হয় নাই; তাহার বুকের মধ্যে যে একখানা খাঁটি হৃদয় ছিল, তাহার অস্তিত্ব আমি নিজের হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে পারিতাম। মানুষের পদগৌরব, অর্থগৌরব, খ্যাতি এবং

বংশমর্য্যাদা হৃদয়ের এই পবিত্রতাকে কখন পরাভূত করিতে পারে না। আমি রামকুমারকে আমার অধীনে চাপরাসীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। সেই হইতে রামকুমার আমার সঙ্গী; বিপদে-সম্পদে, সুখে দুঃখে সে কখন আমার সঙ্গছাড়া হয় নাই।

মফস্বলে ঘুরিয়া বেড়ান যাহাদের চাকুরী, তাহাদিগকে অনেক সময় অনেক বিপদে পড়িতে হয়; আমাকেও মধ্যে মধ্যে বিপদে পড়িতে হইত। এক দিনের কথা বলি।

সেদিন বৈশাখ মাস। বৈশাখের অপরাহ্ণ সাধারণতঃ পরিষ্কার থাকে না। অধিকাংশ সময়ই ঝড় বৃষ্টি লাগিয়া থাকে। আমি সে দিন ঘটনাক্রমে খুলনার অপর পারে একটা তদারকে যাইতে বাধ্য হইলাম; সঙ্গে রামকুমার। রামকুমার সে গ্রাম বিশেষরূপ চিনিত। সেখানে একটা ফাঁড়ী ছিল, ফাঁড়ীর লোকের সাহায্যে আমার কার্য্যসিদ্ধি হইবে স্থির করিয়া অন্য লোক সঙ্গে লই নাই।

যখন নৌকায় উঠিলাম, তখন পশ্চিমাকাশে অল্প মেঘ করিয়াছিল। রামকুমার বলিল, এ মেঘ শীঘ্রই কাটিয়া যাইবে। যাহা হউক আমরা তাড়াতাড়ি চলিলাম; কিন্তু মেঘ কাটিয়া গেল না; অবিলম্বে ঝড়বৃষ্টি আমাদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে আরও আধ মাইল নৌকা চালাইয়া তবে কূলে পৌঁছিলাম। তখন ঝড় আরও প্রবল হইয়া উঠিল।

নদীতীরে একখানি বড় ঘর; উপায়ান্তর না দেখিয়া আমরা সেই ঘরে আশ্রয় লইলাম। রামকুমার বলিল, এ খানি সেই গ্রামের স্কুলঘর। দ্বার বন্ধ ছিল, রামকুমার কৌশলে ঘরের একটা দ্বার খুলিয়া ফেলিল। সঙ্গে বাতি ও দিয়াশলাই ছিল; লণ্ঠন জ্বালাইয়া রামকুমার কয়েকখানা

বেঞ্চ একত্র করিয়া একখানা চৌকি রচনা করিল। বিছানা বালিস সমস্ত ভিজিয়া গিয়াছিল; রামকুমার ঘরের মধ্যেই কাপড় চোপড় বিছানা শুকাইতে দিল। আহারের কি ব্যবস্থা হইবে তাহাও সে জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম, "রামকুমার, এমন রাত্রে আর কোথায় কি মিলিবে? গ্রামের মধ্যে যাওয়াও দুঃসাধ্য। এক রাত্রির অনাহারে মরিব না, তুমি কোন চিন্তা করিও না।"—আমি দক্ষিণ বাহুমূলকে উপাধানে পরিণত করিয়া সেই একত্রে সংযোজিত বেঞ্চত্রয়ের উপর শুইয়া পড়িলাম। দক্ষিণের দিকের একটা দ্বার মুক্ত ছিল, তাহা দিয়া বায়ু-প্রবাহ ও বিদ্যুতের চঞ্চল আভা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল; আমি সেই বিদ্যুদ্দামস্ফুরিত, ঝটিকালুণ্ঠিত নৈশ প্রকৃতির প্রলয় দৃশ্যের দিকে চাহিয়া রহিলাম। পৃথিবীতে আমি একা; এই নির্জ্জন মাঠে, এই স্তব্ধ ঘরে আমার হৃদয়ের দুঃসহ নিঃসঙ্গতা বাহিরের বিজনতার মধ্যে নব জাগ্রত হইয়া উঠিল। চিন্তার তাড়নায় আমি ভুলিয়া গেলাম রামকুমার আমার ছায়ার ন্যায় আমার কাছে বসিয়া আমার পদসেবা করিতেছে; রামকুমারও নীরব।

কিয়ৎক্ষণ পরে আমি সবিস্ময়ে উঠিয়া বসিলাম। বোধ হইল আমার পাদমূলে দুই এক বিন্দু জল পড়িয়াছে; নিশ্চয়ই ইহা বৃষ্টির জল নহে। আমি উঠিয়াই রামকুমারের মুখের দিকে চাহিলাম, লণ্ঠনের আলোকে দেখিলাম তাহার উভয় গণ্ড অশ্রুধারায় ভাসিয়া যাইতেছে। বুঝিলাম তাহারই গণ্ড-প্রবাহিত দুই বিন্দু অশ্রু আমার পাদমূলে পড়িয়াছে।

আমাকে চকিত ভাবে উঠিতে দেখিয়া রামকুমার কিছু অপ্রতিভ হইল; আত্মসংবরণ করিয়া তাড়াতাড়ি সে চোখ মুছিল; বোধ হয় সে ভাবিয়াছিল তাহার অন্তরের যে অবরুদ্ধ যাতনা, তাহাতে আর

কাহারও অধিকার নাই এবং তাহার হৃদয়-বেদনার সান্ত্বনা অন্যের নিকট লাভের আশা তাহার পক্ষে দুরাশা মাত্র!—আমি সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রামকুমার, তোর হয়েছে কি? এমন করিয়া কাঁদছিস্ কেন? আর ত কোন দিন তোকে কাঁদতে দেখি নাই।"

রামকুমার আমার সেই স্নেহার্দ্র কথা সহিতে পারিল না; সে কোন উত্তর না করিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। প্রতি মুহূর্ত্তে লণ্ঠনের বাতিটা জ্বলিয়া জ্বলিয়া গিয়া ক্ষয় হইতে লাগিল এবং বাহিরের অন্ধকার ও দুর্যোগ ঘনীভূত হইয়া উঠিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে রামকুমার আত্মসংবরণ করিয়া কথা কহিল; বলিল, "বাবুজি, এই আমার জন্মস্থান। এই স্কুলের ঘাটে আমি আমার ডিঙ্গিতে করিয়া মানুষ পার করিতাম।"—রামকুমার নীরব হইল।

আমি ভাবিলাম, বহুদিন পরে স্বগ্রামে নিজের পারঘাটায় আসিয়া রামকুমারের পূর্ব্বস্মৃতি জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। রামকুমারের পূর্ব্বজীবন অপেক্ষা তাহার অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু আর্থিক উন্নতির উপরই কি মানুষের সকল সুখ নির্ভর করে? তাহার সেই উদ্বেগহীন, প্রকৃতির স্বহস্তরচিত সরল শৈশব, তাহার পিতামাতার স্নেহপূর্ণ হৃদয়, নদীপ্রান্তবর্ত্তী গোময়লিপ্ত কুটীর, তরঙ্গমালা-ভূষিত খরগতি ভৈরবের উপর তাহার সেই ক্ষুদ্র তরণীর পরিচালন, এই সকল মধুর স্মৃতি হয় ত আজ সহসা তাহার প্রৌঢ় জীবনের এই বৈচিত্র্যহীন, সরকারী চাকরীর অবসাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে।—আমি বলিলাম, "রামকুমার, ছেলেবেলার কথা মনে করিয়া কাঁদিতেছ? চিরকাল কি এক ভাবে যায়?

সুখ এ পৃথিবীতে নাই। সুখের অভাবে যদি কাঁদিতে হইত, তাহা হইলে চিরজীবন কাঁদিয়াই কাটাইতাম।"—শিক্ষিত, সুসভ্য পাঠক, ক্ষুদ্র চাপরাসীর সঙ্গে আমি এ ভাবে কথা কহিলাম, আমার এ অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। নিদারুণ নৈশ প্রলয়ানুষ্ঠানের মধ্যে সেই নির্জ্জন নদীকূলে এক স্তব্ধ গৃহে বসিয়া তখন আমার কেবলই মনে হইতেছিল, সংসার ছাড়িয়া শ্মশানে আসিয়াছি; জীবন-তরণী আজ মৃত্যুর সুচির লক্ষ্য অন্ধকার কূলে আসিয়া ভিড়িয়াছে; মাথার উপর ঐ মেঘমণ্ডিত অন্ধকার আকাশ; দিগ্‌দিগন্ত ধ্বনিত করিয়া যে বজ্রনাদ কানে আসিয়া বাজিতেছে, তাহা কর্ণ-বিবরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই ত লোল-রসনা সৌদামিনী রাক্ষসীর সামান্য স্পর্শমাত্রে দেহ-বৃন্ত হইতে জীবন পুষ্পটি খসিয়া পড়িতে পারে!—বাহিরের অহঙ্কারের খোলস ছাড়িলে ভিতরের সব মানুষ এক।

যাহা হউক, রামকুমার আমার কথায় কোন সান্ত্বনা লাভ করিল কি না জানি না, কিন্তু তাহার হৃদয়ের আবেগ প্রশমিত হইল না; সে কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "বাবুজি, আপনি আমার সব কথা জানেন না। সে সকল কথা কাহাকেও বলি নাই। আজ বলিব। আমি মহা অপরাধী; আমি নরহত্যা, ব্রহ্মহত্যা করিয়াছি। আমি বুঝিতেছি, সে কথা শুনিয়া আপনি আমাকে ঘৃণা করিবেন;—করুন, সে কথা আজ আমি বলিব। পরমেশ্বরের কাছে আমি অপরাধী হইয়া আছি; মানুষের ঘৃণা, মানুষের দণ্ডকে আমি কি ভয় করিব?"—আমার বিশ্বস্ত ভৃত্য রামকুমার নরঘাতক! পৃথিবীতে নিশ্চয়ই মুখ দেখিয়া মানুষ চেনা যায় না। এই রামকুমারের মনেও কোন পাপ থাকিতে পারে, একথা আমি বিশ্বাস করি না।—আমি সন্দেহাকুল নেত্রে রামকুমারের অশ্রুসজল চক্ষের দিকে

চাহিলাম,—বুঝিলাম অনুশোচনায় তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। বলিলাম, "রামকুমার, তোমার মনের কথা যতই গোপনীয় হোক—আমাকে বলিতে পার। মহা অপরাধীকেও পরমেশ্বর ক্ষমা করেন। তোমার পাপ কি বল। পাপীর প্রতি আমার ঘৃণা নাই, তোমার প্রতি আমার স্নেহ কখন বিলুপ্ত হইবে না।"

রামকুমার বলিল—"মা স্বর্গে চলিয়া গেলেও কিছু দিন ধরিয়া আমি এই ভৈরবে মাছ ধরিতাম এবং নৌকায় করিয়া লোক জন পার করিতাম। মনে করিয়াছিলাম, একটা বিবাহ করিয়া সংসারধর্ম্ম করিব; বিবাহের কথাও স্থির হইয়াছিল। কত বৎসরের কথা মনে নাই, কিন্তু মনে আছে তখন বৈশাখ মাস। একদিন সন্ধ্যার আগে খুব মেঘ করিয়া অন্ধকার হইয়া আসিল। নদীতে তুফান উঠিল দেখিয়া আমি তাড়াতাড়ি আমার নৌকাখানা নদীর কিনারায় বাঁধিয়া তীরে উঠিলাম। তখন এ স্কুল ঘর হয় নাই; এখানে একখানা ছোট মুদীখানার দোকান ছিল। দোকানদারের বাড়ী গ্রামের মধ্যে; সন্ধ্যার মেঘ দেখিয়া সে সকালে দোকান বন্ধ করিয়া গিয়াছিল। আমি ঝড় জলের মধ্যে আর বাড়ী যাইতে পারিলাম না; সেই দোকানের বারান্দায় গিয়া বসিলাম। পাশেই একটা শিমুল গাছ ছিল; মড় মড় করিয়া তাহার দুটো ডাল ঝড়ে ভাঙ্গিয়া পড়িল, বাঁশ ঝাড়ের যত বাঁশ ছিল, তাহাদের লম্বা আগা মাটিতে লুটোপুটি করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে কড়কড় কড়কড় শব্দে চারিদিক কাঁপাইয়া আমার চক্ষুর উপর ঐ কানাইখালির নীলকুটীর লম্বা চিমনিটার উপর বাজ পড়িল। আমি কোঁচার কাপড় গায়ে জড়াইয়া সেই বারান্দায় একটা বাঁশের খুঁটায় ঠেস দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম।

আবার বিদ্যুতের ঝলক দিল।—সেই আলোকে দেখিলাম দোকান

ঘরের সম্মুখে দুইটি মানুষ মূর্ত্তি, একটি স্ত্রীলোক আর একটি পুরুষ।—প্রথমে অনুমান হইল, হয় ত প্রেতদেহ। তাহারা আমার নিকটে আসিল; বিদ্যুতের আলোকে আমাকে দেখিতে পাইয়া পুরুষটি সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"কে ও?" বোধ হয় তাহারাও আমাকে ভূত মনে করিয়াছিল। আমি বলিলাম—"আমি রামকুমার মাঝি।"—উভয়ে দোকানের বারান্দায় আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। পুরুষটি বলিল—"মাঝি, আমাদের পার করে দাও।"

পার! এই তুফানে নদী পার হইতে চাহে এমন মানুষ ব্রহ্মাণ্ডে আছে বলিয়া আমার জ্ঞান ছিল না। এমন ঝড় জলে নদী পার করিতে পারে, এমন মাঝি বোধ করি পৃথিবীতে নাই।—আমি অবাক্ হইয়া এই অপরিচিত লোক দুটির দিকে চাহিয়া রহিলাম; অন্ধকারে তাহাদের চেহারা নজরে পড়িল না।

আবার বিদ্যুৎ চমকিল। এবার যুবককে দেখিয়া লইলাম; —যুবকের বয়স ১৮।১৯; বলিষ্ঠ দেহ; যুবকের সঙ্গিনী ১৪।১৫ বৎসরের নবীনা বলিয়া বোধ হইল; ঘোমটার ভিতর হইতে একবার মাত্র তাহার মুখ দেখিয়াছিলাম—তাহার পর আর একবার যখন দেখিয়াছিলাম—সে কথা যাক্।

যুবকের মুখে তাহাদের পরিচয় পাইলাম। ইহাদের বাড়ী দূরবর্ত্তী কোন গ্রামে; সঙ্গের মেয়েটি তাহার ভগিনী, কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে, এখন বিবাহ হয় নাই। সেদিন তাহারা মামার বাড়ী যাইতেছিল। সেখানে তাহার মাতা মৃত্যু-শয্যায় পড়িয়া আছে। সেই রাত্রেই তাহাদের পার করিয়া না দিলে তাহাদের অদৃষ্টের আর মাতৃদর্শন হয় না। যুবক বলিল, যদি চেষ্টা করিতে গিয়া নদীগর্ভে তাহাদের প্রাণ যায় তাহাতেও স্বীকার। এমন

আগ্রহভরে যুবক আমাকে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিল যে আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। মা মরণাপন্ন; ভদ্রলোকের ছেলেমেয়ে প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া এমন ভয়ানক দুর্যোগের মধ্যে নদীতীরে দাঁড়াইয়া আমার সাহায্য ভিক্ষা করিতেছে; আর আমি দেড় কুড়ি বছর বয়সের জোয়ান রামকুমার মাঝি; আমার দুখানা হাতে অসুরের মত বল, আমি যদি প্রাণের ভয়ে তাদের পার করিয়া না দিই, তাহা হইলে আমি এতদিন বৃথা মাঝিগিরি করিয়াছি!

আমি বসিয়াছিলাম, উঠিয়া কোমর বাঁধিয়া নৌকার কাছে চলিলাম। ঝড়ের ও বৃষ্টির বেগ তখন একটু কমিয়া আসিয়াছিল। যুবক ও তাহার ভগিনী নৌকায় উঠিল। আমি বলিলাম, "তোমরা নৌকা ভাল করিয়া ধরিয়া হুসিয়ার হইয়া বোসো।"—'দরিয়ার পাঁচপীর গাজির বদর' বলিয়া আমি নৌকা খুলিয়া দিলাম। ভৈরব হুহু করিয়া গর্জ্জন করিতেছে; চারিদিকের নালা হইতে হুড় হুড় শব্দে মাঠের জল নদীর মধ্যে গিয়া পড়িতেছে। আমি প্রাণপণ শক্তিতে নৌকা চালাইতে লাগিলাম।—কিন্তু পরমেশ্বরের যাহা ইচ্ছা, মানুষে চেষ্টা দ্বারা তাহা বিফল করিতে পারে না; মাঝগাঙ্গে স্রোতের বেগে সহসা হাল ভাঙ্গিয়া গেল; ভয়ানক কড়া জল, আমি নৌকা সামলাইতে পারিলাম না; একটা প্রবল ঢেউ লাগিয়া নৌকা উল্‌টাইয়া গেল। ভৈরব গর্জ্জিয়া উঠিল; অন্ধকার, ঘোর অন্ধকারে আকাশ, পৃথিবী, নদীর জল সমস্ত আচ্ছন্ন হইল! বোধ হইল পৃথিবীতে প্রলয় আসিয়াছে; আমি "দুর্গা, এ কি করিলে মা" বলিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলাম।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মগ্নপ্রায় নৌকার অপর দিক হইতে যুবক বলিয়া উঠিল, "মা মা, রামকুমার, মা কোথায়? মাকে ত এ জীবনে আর দেখা

হল না!” আর কোন শব্দ শুনিতে পাইলাম না। আমি প্রবল মৃত্যু স্রোত তুচ্ছ করিয়া সেই শব্দের দিকে লক্ষ্য করিয়া সাঁতরাইতে লাগিলাম; ইচ্ছা হইল চরম সাহসে ভর করিয়া, আমার ত্রিশ বৎসর বয়সের প্রাণ-পণশক্তি লইয়া, আমার অসুরের মত বলবান দুখানা হাত দিয়া সেই অবলম্বনহীন যুবকযুবতীকে জল হইতে টানিয়া তুলি, তীরের দিকে লইয়া যাই; এ চেষ্টায় যদি মরিতে হয় তাহাতেও দুঃখ নাই, পৃথিবীতে কিসের আশায় বাঁচিয়া থাকিব?

কিন্তু কাহাকেও খুঁজিয়া পাইলাম না। সেই অন্ধকার রাত্রে, সেই উন্মত্ত, উদ্দাম, উচ্ছ্বসিত ভৈরবের মধ্যে প্রবল স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া যতক্ষণ সাধ্য যুবকযুবতীর অনুসন্ধান করিলাম,—কোথায়ও তাহাদের পাইলাম না!

নদীতীরে কাশবন, শরবন, সৈকতপুলিনে পাগলের ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। বৃথা চেষ্টা!

তখন আমি ক্লান্ত শরীরে তীরে উঠিয়া তাহাদের কত অনুসন্ধান করিলাম; বায়ুর শব্দ কানে আসিয়া বাজিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি শুনিতে পাইলাম,—“মা, মা, মা কোথায়?”—“মা, মা, মা কোথায়?” নদীতরঙ্গ বায়ুতরঙ্গের সহিত মিলিয়া অন্ধকার প্রান্তর ধ্বনিত করিয়া কেবলই চীৎকার করিতেছে, “মা, মা, মা কোথায়?” তাহার পর কতদিন গিয়াছে; তবুও যখনই আকাশে ঘনকৃষ্ণ মেঘের সঞ্চার হয়, তুমুল গর্জ্জনে ঝড় বহিতে থাকে, তখনই ভৈরবের সেই মহাপ্রলয়ঙ্কর ভৈরব মূর্ত্তি আমার মানসনয়নের সম্মুখে উপস্থিত হয়; তখনই আমি যেন শুনিতে পাই কে যেন গগন পবন ভেদ করিয়া বলিতেছে, “মা, মা, মা কোথায়?”

রাত্রি প্রভাত হইল। প্রভাতে খুঁজিতে খুঁজিতে দেখি আমাদের গ্রাম হইতে প্রায় আধ মাইল ভাটিতে একটি চড়ার উপর ভগিনীটিকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া যুবক মরিয়া রহিয়াছে। প্রভাত-রৌদ্র তাহাদের মুখে বিকীর্ণ হইতেছে—ঝটিকাশ্রান্ত ভৈরব তাহাদের পদতল দিয়া তরগতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে—তাহাদের যুদ্ধশ্রান্ত মুখের উপর মৃত্যু নির্ব্বিকার শান্তির ছায়া ফেলিয়া গিয়াছে। আমি তাহাদের কাছে বসিয়া চক্ষুর জলে বালুকারাশি ভিজাইতে লাগিলাম। আমিই দুটি প্রাণীর মৃত্যুর কারণ; আমি অন্যায় সাহস করিয়া সে রাত্রে পারে লইবার চেষ্টা না করিলে কি তাহারা মরিত ?

সে দিন হইতে আমার কি হইয়াছে; এই ভৈরবের ধারে আমি সেই ধ্বনি শুনিতে পাইতাম "মা, মা, মা কোথায় ?"—আমি মাছ ধরা, নৌকা বহা ছাড়িয়া দিলাম; নৌকাখানা কুটীরখানা বিক্রয় করিয়া তীর্থ-যাত্রা করিলাম। কত তীর্থে ঘুরিলাম, মনের আক্ষেপ কিছুতেই ঘুচিল না। তারপর আপনার কাছে চাকরী লইয়াছি, কিন্তু সেই রাত্রির কথা ভুলিতে পারিতেছি না;—আজ এই বৈশাখের রাত্রে এ স্থানে আসিয়া নূতন করিয়া সে কথা মনে হইয়াছে,—ঐ শুনুন।"

রামকুমার সহসা নীরব হইল।—লণ্ঠনের মধ্যে বাতিটা জ্বলিয়া জ্বলিয়া হঠাৎ ধপ্ করিয়া নিবিয়া গেল। অন্ধকারের মধ্যে রামকুমার নীরব; আমার মুখেও একটা কথা নাই। স্কুল ঘরের একটা ভাঙ্গা জানালার ভিতর দিয়া সেই মধ্য রাত্রের উদ্দাম বায়ুপ্রবাহ সাঁ সাঁ করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল—তাহার প্রত্যেক কম্পনে আমি শুনিতে লাগিলাম, "মা, মা, মা কোথায় ?"—"মা, মা, মা কোথায় ?"—

সে রাত্রে আর আমার ভাল ঘুম হইল না ; দুই একবার তন্দ্রা
স্বপ্ন দেখিলাম—উন্মত্ত ভৈরব ভৈরব-গর্জ্জনে ছুটিয়া চলিয়াছে,
তাহারই ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে একটি যুবক তাহার ভগিনীটিকে বুকের
জড়াইয়া ধরিয়া কণ্ঠাগত প্রাণের সমস্ত আবেগ ঢালিয়া বলিতে
"মা, মা, মা কোথায় ?" চরাচরের সর্ব্বত্র হইতে এই করুণ ক
প্রতিধ্বনি উত্থিত হইতেছে ;—কেবল মানুষের সুখ দুঃখে চির-উদা
জড় পৃথিবী অন্ধ আবেগে আপনার গতিপথে আবর্ত্তন করিতেছে।

অদৃষ্ট।

সে আজ পাঁচ ছয় বৎসরের কথা। তখন আমি কলিকাতার কলেজে বি-এ ক্লাসে পড়ি। তখনও বিবাহ করি নাই। বয়স বোধ হয় তখন আঠারো কি উনিশ। এইটুকু বলিয়াই যদি চুপ করি, তাহা হইলে পাঠকগণ মনে মনে আমার একটা মূর্ত্তি ঠাওরাইয়া লইবেন। আমি চাঁদের আলো দেখি, জ্যোৎস্না খাই, প্রণয়কবিতা লিখি, বাঁশীর রবে আকুল হই, কিশোরী কি যুবতীর প্রেমে দিশেহারা হইয়া সারা নিশি আকাশের দিকে চাহিয়া থাকি, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা এক সঙ্গে করিয়া আমার একটী মূর্ত্তি হয় ত অনেকে খাড়া করিয়া লইবেন। দোহাই ধর্ম্মের, আমার সে সব কিছুই ছিল না। বি-এ ক্লাসে পড়ি, উনিশ বৎসর বয়স, অবিবাহিত, ঘরে কিঞ্চিৎ আহার সংস্থান আছে; এ অবস্থায় আমার পক্ষে কবিতারাজ্যে ভ্রমণই কর্ত্তব্য; নতুবা জীবন যৌবন যেন বৃথা বহিয়া যায়। কি করিব, আমাকে ভগবান সে ছাঁচে ঢালেন নাই। প্রেম, ভালবাসা, কবিতা লেখা, হা হতোস্মি করা বিধাতা পুরুষ আমার অদৃষ্টে লেখেন নাই। কলিকাতার একটা মেসে থাকি, রোজ রোজ কলেজে যাই, বাসায় আসিয়া পড়া তৈয়ার করি, সন্ধ্যার সময়ে একটু গোলদীঘির ধারে বেড়াই, রাত্রে পড়ি, খাই দাই, ঘুমাই; ইহাই আমার দৈনিক কর্ত্তব্যকর্ম্ম। তাহার পর যখন সেই বর্দ্ধমান জেলার এক প্রান্তে একটী ক্ষুদ্র গ্রামের স্নেহশীতল মাতৃক্রোড়ে যাইয়া বসি, তখন কলিকাতা, কলের জল, বরফ, লিমনেড, কেতাব, কোরাণ কিছুই আমার মনে থাকে না; তখন বিধবা মায়ের স্নেহে,

বিধবা ভগিনীর আদরে আমার ছুটীর দীর্ঘ দেড় মাস দেড় দিনের মত কাটিয়া যায়। শেষে অশ্রুপূর্ণ চক্ষে মা ও দিদিকে প্রণাম করিয়া, তাঁহাদের পদধূলি লইয়া, তাঁহাদের স্বর্গীয় স্নেহের অভেদ্য বর্ম্মে আবৃত হইয়া কলিকাতায় পড়িতে যাই। প্রেম, ভালবাসা, কবিতা, নিরাশ প্রণয়ের কোন সুবিধাই আমার ঘটিয়া উঠে নাই। এ হেন অরসিক 'আণ্ডার গ্রাজুয়েট'কে হয় ত আপনারা সে সময়ে চিনিতে পারিলে কালেজের খাতা হইতে নাম কাটিয়া দিতেন। কিন্তু কি করিব, ভাগ্যলক্ষ্মী আমার প্রতি সে সময়ে বড়ই অপ্রসন্ন ছিলেন। কিন্তু তার পরে আমি মায় সুদ সমস্ত বুঝিয়া পাইয়া ছিলাম। সেই কথা বলিবার জন্যই ত এই কালী কলম খরচ।

যে বৎসরে আমি বি, এ পরীক্ষা দিব, সেই বৎসরের ফাল্গুন মাসে একদিন বাড়ী হইতে পত্র পাইলাম, আমার দিদির বড় অসুখ। সে সংবাদ পাইয়া আমি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলাম না। সংসারে মা ও ঐ ভগিনী ব্যতীত আপনার বলিবার আমার কেহই ছিল না। যে দিন পত্র পাইলাম, সেই দিনই রোগীর পথ্যের মত জিনিস পত্র যাহা যাহা দরকার হইবে মনে করিলাম, তাহা লইয়া বাড়ী চলিয়া গেলাম। বৈঁচি ষ্টেশন হইতে ঘোড়ার গাড়ী চড়িয়া বাড়ী যাইতে হয়। রাত্রি প্রায় নয়টার সময়ে বাড়ীতে পৌছিলাম। দিদির জ্বর তেমন নয়; আমি এত কষ্ট করিয়া, এমন ব্যস্ত হইয়া পড়াশুনা ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি দেখিয়া দিদি মাকে বকিতে লাগিলেন। যথাসময়ে দিদি অন্নপথ্য করিলেন; আমি কলিকাতায় আসিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। কিন্তু দিদি আমার কলিকাতায় আসিবার নানা বাধা দিতে লাগিলেন; আজ অশ্লেষা, কাল মঘা, আজ দিকশূল, কাল ত্র্যহস্পর্শ;

এমনি করিয়া আমাকে পাঁচ ছয় দিন বাড়ীতে রাখিলেন। অথচ যে দিন দিদির অসুখের সংবাদ শুনিয়া বাড়ীতে আসিয়াছিলাম, সে দিন কলেজ কামাইয়ের জন্য দিদিই বকিয়াছিলেন! স্নেহের এমনই টান। বর্দ্ধমান হইতে যে লোকাল ট্রেণ বেলা আড়াইটার সময় বৈঁচি ষ্টেশনে পৌঁছে আমি সেই ট্রেণে কলিকাতায় আসিতেছি। সঙ্গে জিনিষ পত্র কিছুই নাই। একখানি মধ্যম শ্রেণীর একটা কামরায় আমি একেলা। সঙ্গে একখানি ইংরাজী বই ছিল, তাহাই পড়িতেছি। এমন সময়ে আমাদের গাড়ী আসিয়া পাণ্ডুয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। কত লোক নামিল, কত লোক উঠিল, আমার গাড়ীতেও দুইজন উঠিলেন; একজন পুরুষ, আর একজন তাঁহার সঙ্গিনী কিশোরী, অথবা ঠিক বলিতে গেলে কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে তিনি দাঁড়াইয়া আছেন। এই দুইজন অপরিচিত আরোহীকে আমার গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আমি একটু ভাল হইয়া বসিলাম; কারণ এতক্ষণে এক বেঞ্চে বসিয়া অপর বেঞ্চে পা দিয়া বেশ আরামে আসিতেছিলাম। আমি যে দিকে জানালার কাছে বসিয়া ছিলাম, ভদ্রলোকটী তাহার সম্মুখেই বসিলেন এবং মেয়েটী অপর প্রান্তের জানালার নিকটে গিয়া বসিলেন। অপরিচিত একজন যুবককে গাড়ীর মধ্যে দেখিয়া মেয়েটী বিশেষ সঙ্কুচিত ভাবে বসিয়া রহিলেন। মাধুরীবিনম্র অশোক-স্তবকের ন্যায় কিশোরীর সঙ্কোচ কি সুমধুর! কাব্যে এতদিন যাহা অনুভব করি নাই, জীবনে এই প্রথম তাহা বুঝিলাম।

গাড়ীতে আমরা দুইজন পুরুষ মানুষ; দুইজনেরই বয়স সমান; এমন অবস্থায় বিনা কথাবার্ত্তায় কি করিয়া বসিয়া থাকা যায়। শুনিয়াছি সাহেবেরা নাকি এমন ভাবে দুই এক দিন কাটাইয়া দিতে

পারেন। এ দক্ষতা আমাদের নাই। আগন্তুক যুবকটিই প্রথমে আমার পরিচয় লইলেন ; আমি কি করি, কোথায় থাকি, বাড়ী কোথায় প্রভৃতি সব কথাই হইল। নাম জিজ্ঞাসা এখনকার দিনে সভ্যতা বা ভদ্রতাবিরোধী, সুতরাং তিনি আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন না ; অথচ অন্যান্য পরিচয় হইয়া গেল। তিনি তাঁহার এই অবিবাহিতা ভগিনীটিকে লইয়া কলিকাতায় যাইতেছিলেন। অনেক স্থান হইতে সম্বন্ধ আসিয়াছে ; কেহ কেহ তাঁহাদের বাড়ীতে আসিয়াও ক'নে দেখিয়া যাইতেছেন ; কিন্তু যাঁহারা খাস কলিকাতাওয়ালা, তাঁহারা বড় সহজে পাড়াগাঁয়ে আসিতে চান না। কলিকাতায় নিজেদের বাসা আছে, ইনি ভগিনীকে লইয়া সেখানেই যাইতেছেন। সেখান হইতে দেখা শুনার সুবিধা হইবে। আমি সহসা কৌতূহলভরে একবার কিশোরীর দিকে চাহিয়া দেখিলাম ; সুন্দরী বটে! কিছু অপ্রতিভ হইয়া চক্ষু ফিরাইয়া লইলাম। কে জানিত ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সে-ও দুখানি শতদল-দলের ন্যায় সুকোমল উৎফুল্ল দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিবে!

ভদ্রলোকটীর সঙ্গে নানা কথা চলিতে লাগিল ; কথায় কথায় তিনি শুনিলেন যে, আমি তখনও বিবাহ করি নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এতদিনও বিবাহ করেন নাই কেন?" আমি বলিলাম "তেমন তাড়াতাড়ি বোধ হইতেছে না ; পাশটাশ গুলো হয়ে যাক্, তখন ধীরে সুস্থে যা হয় করা যাবে।" তাহার পর অন্যান্য অনেক কথাবার্ত্তায় অনেক সময় কাটিয়া গেল। হাবড়া ষ্টেশনে গাড়ী আসিয়া লাগিল। তাঁহারা তাঁহাদের ঘরে চলিয়া গেলেন। আমি একখানি তৃতীয় শ্রেণীর 'অনিন্দ্য-সুন্দর' গাড়ী ভাড়া করিয়া আমার আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মেসে আসিয়া পৌঁছিলাম।

এই রাত্রিতে যদি সেই যৌবনাগম-সঙ্কুচিতা কুমারীর সেই আকর্ণ-বিশ্রান্ত লোচন, তাহার সেই সরলতাময়ী স্নেহ-কোমল মুখখানি মনে করিয়া ভাত খাইবার সময়ে দুধের বাটীর বদলে অম্বলের বাটীতে চুমুক দিতাম, মুখে ভাত তুলিতে নাকে গুঁজিতাম, আহার করিতে করিতে অন্যমনস্ক হইতাম এবং ঝির কথায় হুঁস হইয়া 'তাই ত' বলিয়া আবার দ্বিগুণবেগে আহার কার্য্যে মনোনিবেশ করিতাম, রাত্রে দক্ষিণ দিকের খোলা জানালার কাছে চেয়ারখানি টানিয়া লইয়া সমস্ত রাত্রি চাঁদের দিকে চাহিয়া, অথবা কবিতা লিখিয়া কাটাইয়া দিতাম, তাহা হইলে গল্পটী বেশ জমিয়া আসিত—বেশ দস্তুর-মাফিক হইত। কিন্তু হা হত-বিধে! হা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস! আমার মত এই একটা নীরস কঠোর মানুষকে কোন প্রকারেই সারাইতে পারিলে না। কেমন সুন্দর নভেলের প্লট একবারে হাতছাড়া হইয়া গেল! কি করিব, আমার দুর্ভাগ্য! সে কিশোরী, না কুমারী; তাহার কথা সে রাত্রে আমার মোটেই মনে হইল না; সারাদিন রেলে আসিয়া, ঘোড়াগাড়ীতে আসিয়া অন্য দিন অপেক্ষা অধিক ভাত খাইলাম; শেষে এরূপ নিদ্রা যে, তার পর দিন বেলা সাড়ে আটটার পূর্ব্বে আর সাড়াশব্দ ছিল না। ভালবাসা ও বিরহের কোন লক্ষণের সঙ্গেই আমার রোগ মিলিল না, চিকিৎসারও কোন ব্যবস্থা করিতে হইল না। তাহাদের কথা মোটেই মনে হয় নাই। তবে একদিন কথায় কথায় বিবাহ ব্যাপারের কথা উঠায় তাহাদের দৃষ্টান্ত দিতে হইয়াছিল।

কলিকাতার মেস্‌গুলি ছোটখাটো এক একটা পার্লিয়ামেণ্ট। সেখানে রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি কঠোর তত্ত্বের মীমাংসা প্রতিদিনই হইয়া থাকে। আমাদের মেস্‌টা আবার খুব জাঁকালো মেস্। আমরা

অনেকগুলি সেখানে থাকিতাম; আমাদের মধ্যে ব্রাহ্ম ছিলেন, হিন্দু ছিলেন, নাস্তিক ছিলেন, এবং এই তিন দলের উপরে যতগুলি উপদল আছে তাহারও মেম্বর আমাদের মেসে ছিলেন। বঙ্গবাসীর দল ছিলেন, সঞ্জীবনীরও দল ছিলেন; তখন হিতবাদী 'হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ' বলিবার আসর খুঁজিতেছিলেন। প্রতিদিনই রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্ম-নীতি লইয়া তুমুল ব্যাপার হইত। কোন দিন গ্ল্যাডষ্টোনকে একেবারে দেশছাড়া করিয়া দেওয়া হইত; কোন দিন সুরেন্দ্রবাবুকে স্বর্গে তোলা হইত; আর শনিবারে বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী আমাদের মেসে আসিলে সেদিন ঝি সকল বাবুদের জন্যই বেশী করিয়া চাউল লইত, কারণ সেদিন সকাল হইতে রাত্রি আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত হিন্দু ব্রাহ্মের একটা কুরুক্ষেত্র হইবেই। এমন কি অনেক দিন থিয়েটারবাজ মেম্বরেরা তর্কের ফেরে পড়িয়া থিয়েটারের সময় পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়া শেষে বড়ই অনুতপ্ত হইতেন। এ হেন সার্ব্বজনিক, সার্ব্ববিষয়িক মহাসভায় একদিন বর্ত্তমান বিবাহ-ব্যাপার উঠিয়াছিল; সেই দিন কথায় কথায় আমার সেই রেলের সঙ্গী সঙ্গিনীর কথা মনে হইয়াছিল এবং তাঁহাদের দৃষ্টান্ত সেই মহাসভায় পেশ করিয়াছিলাম। বাল্যবিবাহ যে নানা কারণে দেশ হইতে উঠিয়া যাইতেছে, তাহারই দৃষ্টান্ত স্বরূপ সেই পঞ্চদশবর্ষীয়া কিশোরীর কথা বলিয়াছিলাম, এবং তখন একবার মনে হইয়াছিল যদি কখন বিবাহ করি, তবে একটা দশ বৎসরের কচি মেয়েকে বিবাহ না করিয়া এই প্রকার পঞ্চদশবর্ষীয়া কুমারীরই পাণিগ্রহণ করিব! কথাটা খুব 'সিরিয়াস্‌লি' বলিয়াছিলাম কি না মনে নাই, তবে এই এক দিন মাত্র তাহাদের কথা আমার মনে হইয়াছিল।

এ ফাল্গুন মাসের কথা। চৈত্র মাস চলিয়া গেল; বৈশাখ মাসের ২৪ শে তারিখে আমার এক বন্ধুর বিবাহ। আমার সেই বন্ধুটীর বাড়ী

যশোহর জেলায়। বিবাহ হইবে হাবড়ায় ; শুনিলাম ক’নের বাড়ী হাবড়ায় নহে; তবে বিবাহ দিবার জন্য তাঁহারা হাবড়ায় আসিয়া আছেন; সেথানেই বিবাহ হইবে। বন্ধুর বিবাহ ; আমরা বরযাত্র। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সকলে মিলিয়া দল বাঁধিয়া হাবড়ায় বিবাহ বাড়ীতে গেলাম। কিন্তু সেখানে গিয়া বড়ই বিপদে পড়িলাম। আমার বন্ধুটী বড়ই ভাল মানুষ; দেশ হইতে তাঁহার পিতা, পিতৃব্য, মাতুল ইত্যাদি অনেক আত্মীয় স্বজন আসিয়াছেন। বিবাহের পূর্ব্বে নগদ কিছু টাকা ও অলঙ্কার দিবার ব্যবস্থা হয় এবং বর্ত্তমান প্রথা অনুসারে যথারীতি একটা ফর্দ্দও প্রস্তুত হয়। কন্যা-কর্ত্তার অবস্থা তেমন ভাল নহে, সেই জন্যই এতদিন মেয়েটীকে বিবাহ দিতে পারেন নাই। শেষে আর কোন দিক না ভাবিয়া আমার বন্ধুর অভিভাবকেরা যাহা চাহিয়াছিলেন তাহাই স্বীকার করেন। তিনি হয়ত মনে করিয়াছিলেন, বিবাহের সময় হাতে পায়ে জড়াইয়া ধরিয়া কিছু মাপ পাইতে পারিবেন। ভদ্র কায়স্থ-সন্তান, লেখা পড়া জানেন ; কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্রের দুঃখ দেখিয়া অবশ্যই তাঁহাদের মন টলিবে এবং ফর্দ্দ মত টাকা ও অলঙ্কার দিতে না পারিলেও ভদ্রলোকের জাতি রক্ষার জন্য বিবাহ বন্ধ রাখিতে পারিবেন না। বিপদে পড়িলে মানুষ পরের সহানুভূতির প্রত্যাশা এতই বেশী করিয়া থাকে।

আমরা ক’নের বাড়ী পৌছিয়া দেখি বিষম গোল বাধিয়া গিয়াছে। কন্যাকর্ত্তা ও তাঁহার দুই পুত্র বরকর্ত্তাদিগের হাতে পায়ে ধরিতেছেন, গলবস্ত্র হইয়া অশ্রুজলে বুক ভাসাইতেছেন। কিন্তু বরকর্ত্তা কিছুতেই রাজী নহেন। নগদ টাকা ও অলঙ্কারগুলি ফর্দ্দ মোতাবেক মিলাইয়া না দিলে তাঁহারা ছেলের বিবাহ দেবেন না। এ কথায় মহা গোলযোগ লাগিয়া গেল। আমরা দুইখানি লুচির আশায় গঙ্গাপার হইয়া এতখানি রাস্তা

আসিলাম, কিন্তু সে কথা আমাদের আর মনে রহিল না। আমি ত স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম, কন্যাকর্ত্তাগণের কান্না দেখিয়া আমার কান্না পাইতে লাগিল। আমি সেখানে দাঁড়াইতে পারিলাম না। সে বাড়ী ত্যাগ করিয়া রাস্তায় আসিয়া বেড়াইতে লাগিলাম; শুধু মনে হইতে লাগিল আজ যদি আমার বন্ধু বিবাহ না করেন, তাহা হইলে এই গরীব ভদ্রলোকের কি উপায় হইবে! অতি দরিদ্র অবস্থা বলিয়াই ইনি এরূপ কর্ম্ম করিয়াছেন। আবার মনে হইল মনুষ্য এমন নির্দ্দয় হইতে পারে না; নিশ্চয়ই বিবাহ হইবে। পথে ঘুরিতেছি আর এই কথা ভাবিতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম বন্ধুটীর পিতা পিতৃব্য আত্মীয় বন্ধু বরযাত্র সকলে গোলমাল করিতে করিতে সে বাড়ী ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, আর বৃদ্ধ কন্যাকর্ত্তা কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাদের পায়ে ধরিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছেন। আমি এ দৃশ্য আর দেখিতে পারিলাম না; আমরা যে কয়েকটি বন্ধু আমাদের মেস্ হইতে গিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে নিকটে ডাকিলাম এবং ধীরভাবে দৃঢ়তার সহিত বলিলাম, "আমি আজ এই বিবাহ করিয়া এই গরীবের দায় উদ্ধার করিব, তোমরা আইস!" আমার কথা শুনিয়া প্রথমে কেহ বিশ্বাস করিলেন না, শেষে যখন আমি প্রতিজ্ঞার কথা বলিলাম, তখন সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। আমরা ফিরিয়া গেলাম। আমার পরিচয় পাইয়া কন্যাকর্ত্তার দুই তিন জন আত্মীয় আমাকে চিনিলেন। ক'নে দেখা হইল না; অলঙ্কারের কথা হইল না; সেই রাত্রে আমি বরযাত্র হইয়া গিয়া বরের আসন অধিকার করিয়া বসিলাম। যৌবন-সুলভ সহানুভূতির উত্তেজনায় মা ও দিদিকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই বিবাহ করিতে বসিয়া গেলাম। যথাসময়ে শুভদৃষ্টি হইল; আমি আর আমার স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিলাম না; আমি তখন একটা খুব উঁচু সুরে হৃদয় বাঁধিয়াছিলাম।

বিবাহের পর যখন আসন হইতে আমার স্ত্রীকে উঠাইতে যায় তখন সকলে দেখিল তাঁহার চেতনা নাই! তাড়াতাড়ি মুখে চোখে জল দিতে দিতে তাঁহার চৈতন্য হইল। আমরা বাসরে চলিলাম। যখন অনেক রাত্রে বাসরঘর মহিলা-শূন্য হইল, তখন আমার নববিবাহিতা পত্নী আমার সঙ্গে কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন, "আপনি আমাকে চিনিতে পারিলেন না! সেই যে একদিন আপনি বর্দ্ধমান হইতে আসিতেছিলেন, সেই দিন আমি আর দাদা আপনার সঙ্গে এক গাড়ীতে আসি। আপনাকে দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল,—কি মনে হইয়াছিল সে কথা বলিতে পারিব না। তবে সেই দিন থেকে আমি আপনার কথা ভুলিতে পারি নাই। ভগবান দুঃখিনীর প্রার্থনায় কান দেন, বিবাহের সময় পর্য্যন্ত আমি তা বুঝিতে পারি নাই।" আমার স্ত্রী নীরব হইলেন, তাঁহার হৃদয়ের আনন্দ মুখমণ্ডলে ফুটিয়া উঠিল, লজ্জা আসিয়া গণ্ডস্থল লোহিতাভ করিয়া তুলিল। আমি বিস্ময়, আনন্দ, কৌতূহলের সহিত সেই একদিনের পরিচিত স্বপ্নদৃষ্টের ন্যায় মধুর মুখ দেখিয়া, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত শারদনিশায় দূরশ্রুত বংশীরবের ন্যায় শ্রবণ তৃপ্তিকর কণ্ঠস্বর শুনিয়া বিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম, আমার মনে হইল আমাদের এই প্রেমবন্ধন দৈবের ঘটনা নহে। যে বন্ধন ইহজীবনের পরপারে দুইটি প্রণয়ী-হৃদয়কে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, ইহজীবনে কোন দিন স্বপ্নেও যাহার অস্তিত্ব অনুভব করি নাই, আজ বিনা চেষ্টায় সহসা তাহাতে বন্দী হইলাম! কি সুখের বন্ধন—এ বন্ধন হইতে ইহজীবনে আর যেন মুক্তিলাভ না ঘটে। মোহ বল, প্রেম বল, আর যাহাই বল, পূর্ণিমার রাত্রে গঙ্গার উভয় কূল প্লাবিত করিয়া যেমন জোয়ার ছুটিয়া যায়, তেমনি একটি অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে, একটা সঙ্কোচহীন হর্ষে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

পরদিন শ্বশুরের প্রদত্ত অলঙ্কারগুলি একে একে খুলিয়া রাখিয়া নিরভরণা স্ত্রীকে লইয়া হঠাৎ বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সমস্ত কথা শুনিয়া মা আমার আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন; গৃহলক্ষ্মীকে বরণ করিয়া ঘরে লইলেন, আমাকে সহস্র আশীর্ব্বাদ করিলেন। সেই মাতৃ-আশীর্ব্বাদ আমার বিবাহিত জীবনের অনন্ত সুখের অমোঘ দৈববাণীরূপে আমার মস্তকে বর্ষিত হইল; এতখানি আশা করি নাই, তাই আনন্দে আমার চক্ষে জল আসিল। আমার নবপরিণীতা পত্নী কি সেই আনন্দাশ্রুর অংশ লাভ করে নাই?

সন্ন্যাসী।

অনেকদিন পূর্ব্বে আমি এলাহাবাদ হইতে গাজিয়াবাদ যাইতেছিলাম। গাজিয়াবাদ ষ্টেসনে North Western রেলওয়ে ধরিয়া আমি সাহারণপুর যাইব। আমি Mixed গাড়ীর আরোহী; বেলা ১২টা কি ১টা, সেই সময়ে ঐ গাড়ী এলাহাবাদ ষ্টেশন ছাড়ে। আমার একখানি মধ্যশ্রেণীর টিকিট ছিল, এলাহাবাদে আর আমাকে টিকিট কিনিতে হয় নাই। সঙ্গে কিছু বোঝা ছিল; বোঝা আমার নহে। আমার নিকট আমি নিজেই এক প্রকাণ্ড লগেজ; দেশ বিদেশে এই ভূতের বোঝা বহিয়া বহিয়াই আমি একেবারে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়াছি, বোঝা কিছুতেই হাল্‌কা হইতে চায় না। নিজের এই প্রকাণ্ড বোঝার উপর অন্য লগেজ বহিবার আমার উপায় ছিল না, কিন্তু কি করি, স্নেহের অনুরোধ উপেক্ষা করিবার শক্তি নাই। এলাহাবাদে যাঁর গৃহে দুই দিন বাস করিয়া আমি মায়ের স্নেহ, ভগিনীর আদর, ভ্রাতার ভালবাসা, পুত্রকন্যার স্নেহের আবদারে প্রাণ শীতল করিয়াছি, তাঁহাদের স্নেহের অনুরোধে সঙ্গে কিঞ্চিৎ লগেজ লইতে হইয়াছিল। বন্ধুর একজন আত্মীয় সাহারণপুরে চাকুরী করেন; তাঁহার জন্য এক বস্তায় বোধ হয় গুটি পনর নারিকেল, এবং এক কলসী খেজুরে গুড় আমার সঙ্গে দেওয়া হইয়াছিল। পশ্চিম প্রদেশে এ দুইটী জিনিষ বড়ই মহার্ঘ।

এই নারিকেলের বস্তা ও গুড়ের কলসী লইয়া আমি এলাহাবাদ

ষ্টেশনে একটি মধ্যশ্রেণীর কামরায় প্রবেশ করিলাম। সে কামরায় অধিক লোক ছিল না; একজন সন্ন্যাসী সর্ব্বাঙ্গ গৈরিক বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া বসিয়া আছেন। মনে করিলাম ভালই হইল; সাধুসঙ্গে, সৎ-প্রসঙ্গে দিনটা কাটিয়া যাইবে। গাড়ীতে উঠিয়া আমার মহামূল্য দ্রব্য দুইটী বেঞ্চের নীচে এক পার্শ্বে বিশেষ যত্ন করিয়া রাখিলাম। তাহার পর কামরার দ্বারের পার্শ্বে বেশ একটু ভাল করিয়া উপবেশন করিলাম। সাধুর দিকে এখন চাহিবার সময় হইল। দেখিলাম লোকটি এখনও রীতিমত সন্ন্যাসী হইতে পারে নাই; মাথার চুলগুলি অতি দীর্ঘ হইলেও এখনও জটা বাঁধে নাই; মুখশ্রী এখনও রৌদ্রদগ্ধ হয় নাই; এখনও সেই গৌর মুখমণ্ডল হইতে সম্পন্ন গৃহস্থের সযত্নপুষ্ট দেহের আভা বাহির হইতেছে। দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় সন্ন্যাসী কোন বড় মানুষের ছেলে, অতি অল্প দিন এ পথে আসিয়াছেন এবং তাঁহার দেহের কমনীয়তা দর্শনে তাঁহাকে শক্তুভোজী বলিয়া কিছুতেই মনে হয় না। বয়স বোধ হয় ২৭।২৮ বৎসর, মুখে দাড়ী আছে। তিনি যে ভাবে উপবিষ্ট রহিয়া-ছেন, তাহাতে বোধ হইল তাঁহার ক্রোড়ে কিছু আছে। কিন্তু একজন সাধুর সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এমন করিয়া অনুসন্ধিৎসুর চক্ষে দর্শন করা ভদ্রনীতিবিগর্হিত মনে করিয়া আমি অপর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। মনে প্রবল আগ্রহ সাধুর সহিত আলাপ করি, কিন্তু তাঁহার শূন্য দৃষ্টি এবং উদাস ভাব দেখিয়া আমি কোন কথাই জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য মনে করিলাম না।

এলাহাবাদ ষ্টেসনে গাড়ী একটু বেশীক্ষণ অপেক্ষা করে। গাড়ী ষ্টেসনে পৌঁছিবামাত্রই আমি উঠিয়া বসিয়াছি; এতক্ষণে বড় জোর পাঁচসাত মিনিট সময় গিয়াছে। সন্ন্যাসী এমন সময়ে আমাকে অতি

মধুর স্বরে (বাঙ্গালায়) জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, বলিতে পারেন এখানে আর কতক্ষণ গাড়ী থাকিবে?" আমি জানিতাম এলাহাবাদে এ গাড়ী আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করে; আমি সেই আধ ঘণ্টা হইতে পাঁচ সাত মিনিট বাদ দিয়া সময় বলিলাম। "অমর, বাবা, একটু উঠে বোস তো" এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসী তাঁহার গৈরিক গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিলেন,—তাঁহার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া একটি ৪।৫ বৎসরের বালক অৰ্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় রহিয়াছে। গাত্রবস্ত্র অপসারিত হইল দেখিয়া বালকটি সন্ন্যাসীর কোলের উপর বসিল। চেহারা দেখিয়াই বলিতে পারা যায়, বালকটি সন্ন্যাসীর পুত্র; মুখশ্রী ঠিক এক, বর্ণ সুন্দর গৌর। পিতাকে দেখিয়া মনে সন্দেহ হইয়াছিল, বড় মানুষের ছেলে; এখন ছেলেটীকে দেখিয়া দৃঢ় বিশ্বাস হইল, অতি সম্ভ্রান্ত গৃহের অধিবাসী। এই দুইটী পিতা পুত্র কোথায় চলিয়াছেন। "মহাশয়, ছেলেটীকে একটু দেখ্‌বেন তো, আমি জল নিয়ে আসি" এই বলিয়া ছেলেটীকে বেঞ্চের উপর বসাইয়া সন্ন্যাসী গাড়ীর মধ্যে দণ্ডায়মান হইলেন। আমি অনেক সুপুরুষ দেখিয়াছি, কিন্তু এই গৈরিক পরিহিত যুবকের মত অনিন্দ্যসুন্দর রূপ আমি আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আমি একদৃষ্টে তাঁহার দিকেই চাহিয়া রহিলাম; তিনি ধীরে ধীরে আমার সম্মুখে আসিয়া গাড়ীর দ্বার খুলিয়া প্ল্যাটফরমে নামিলেন। আমি তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া ছেলেটিকে কোলে করিতে গেলাম। আমাকে উঠিয়া যাইতে দেখিয়াই সন্ন্যাসী বলিলেন "আপনাকে কষ্ট কোরে' যেতে হবে না, ও বেশ চুপ কোরে বোসে থাকবে।" আমি যতটুকু অগ্রসর হইয়াছিলাম সেইখানেই বেঞ্চে বসিয়া পড়িলাম। ছেলেটির মুখখানি এমনই সুন্দর, আর এমনই হাসিমাখা যে, দেখিলেই ভাল-

বাসিতে ইচ্ছা করে। আমি কথা বলিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না; অতি ধীরে জিজ্ঞাসা করিলাম "উনি তোমার কে হন বাবা?" "আমার বাবা!" ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করি তোমাদের বাড়ী কোথায়; কিন্তু সে ইচ্ছা নিবারণ করিলাম; সন্ন্যাসীর যদি আত্মগোপন অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে এই বালকটীর নিকট হইতে সে সংবাদ গ্রহণ করা আমার পক্ষে বিশেষ অন্যায় কাজ। আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি কি খেয়েছ?" "দুধ খেয়েছি।" "এখন খিদে পায় নি?" "না, রাত্রে খিদে পাবে।" আমি আরও কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতে-ছিলাম, এমন সময়ে সন্ন্যাসী আসিয়া গাড়ীতে উঠিলেন; তাঁহার হস্তে একটা নূতন পিতলের কমণ্ডলুপূর্ণ জল। গাড়ীতে উঠিয়াই তিনি ছেলেটির কাছে গিয়া বলিলেন, "অমর, জল খাবে?" "খাবো" বলিয়া বালকটি সেই কমণ্ডলু দুই হাতে ধরিয়া জল পান করিল। তাহার পান শেষ হইলে সন্ন্যাসী কমণ্ডলুটা পাশেই রাখিয়া দিলেন এবং বালকটিকে কোলে লইয়া বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিলেন। আমার মনে হইল এই অল্পক্ষণের জন্য শিশুটিকে বক্ষঃচ্যুত করিয়াই সন্ন্যাসীর বুক বুঝি বড়ই খালি বোধ হইয়াছিল, তাই শিশুটিকে এমন করিয়া বুকের মধ্যে ধরিলেন। আমি তাঁহার সেই একটী কার্য্যেই তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত আবেগ বুঝিতে পারিলাম; বুঝিলাম এই পাঁচ বৎসরের বালকটিই সন্ন্যাসীর জপ, তপ, জীবনের ধ্রুবতারা।

আমি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না; সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কোথায় যাবেন?" "সাহারণপুর হ'য়ে হরিদ্বার যাব।" আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, হরিদ্বার যাইবার সোজা পথ থাকিতে তিনি এ বাঁকা পথ ধরিলেন কেন। তাহার জবাবে বুঝিলাম যে,

তাঁহাকে সাহারণপুর হইয়াই হরিদ্বার যাওয়ার পথ একজন বলিয়া দিয়াছিল, তাই তিনি সেই পথেই যাইতেছেন। আমিও সাহারণপুর অবধি যাইব, এ কথা তাঁহাকে জানাইলাম। তিনিও সহর্ষে "বেশ তো এক সঙ্গে অনেক পথ যাওয়া যাবে" বলিলেন। তার পর আর কথা নাই।

আমি এদিকে কিন্তু সন্ন্যাসীর বিবরণ জানিবার জন্য বড়ই উৎসুক হইয়া পড়িয়াছি এবং কেমন করিয়া আবার কথা পাড়িব তাহাই ভাবিতেছি। কিন্তু আমাকে সে ভাবনা করিতে হইল না, সন্ন্যাসী কথা পাড়িলেন এবং আমার গন্তব্য স্থানের সংবাদ লইলেন এবং অন্যান্য সংবাদও লইলেন; তার পর যখন শুনিলেন যে আমার কোন কিছুই ঠিক নাই, আমি বুকভরা একটা শ্মশানবহ্নি লইয়া দেশময় ছুটিয়া বেড়াইতেছি, তখন সেই সন্ন্যাসীর মর্ম্মের অন্তস্তল হইতে এমন একটি কাতর "ওঃ!" বাহির হইল যে, তাহার শোককম্পনে আমার হৃদয় পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়া উঠিল। সেই একটি অস্ফুটব্যক্ত কাতরোক্তির ভিতর দিয়া সন্ন্যাসীর হৃদয়ের জ্বলন্ত অগ্নিশিখা শত মুখে বাহির হইয়া পড়িল। আমার আর কথা বলিবার শক্তি রহিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

সন্ন্যাসীর অব্যক্ত কাতর উক্তিতেই তাহার হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম। যে নিদারুণ যন্ত্রণা বুকে লইয়া আমি গৃহত্যাগী, সন্ন্যাসীও তাই; কেবল প্রভেদ তাঁহার কোলে একটি কুসুমকোমল বালক। স্মৃতি ত নষ্ট হয় না, মনে পড়িল আমারও একটি পুষ্পস্তবকবৎ নয়নানন্দদায়িনী বালিকা ছিল; প্রস্ফুটিত ফুলের ন্যায় সুন্দর, হায়, তেমনি ক্ষণস্থায়ী! এখনো সে কথা মনে হইলে বুকের

মধ্যে দীর্ঘশ্বাস ঘনীভূত হইয়া নয়নকোণে অশ্রুরূপে ফুটিয়া উঠে; কিন্তু সে কথা থাক্।

চিন্তা মানুষের আজ্ঞার দাসী নহে। গাড়ীর বেঞ্চে বসিয়া কত কথা ভাবিতে লাগিলাম; সন্ন্যাসীর কথা ভাবিতে ভাবিতে আমি আমার নিজের অকূল ভাবনায় ডুবিয়া গেলাম। সে সময়ে আমার ইহাই হইত; অপরের দুঃখের কাহিনী শুনিতে বসিলে আর তাহার শেষ পর্য্যন্ত শুনিতে পারিতাম না, আমার নিজের চিরদুঃখময় জীবনের কোন এক তন্ত্রীতে আঘাত লাগিলেই আমি নিজের মধ্যে ডুবিয়া যাইতাম।

সন্ন্যাসী ও তাঁহার সুন্দর বালকটি ধীরে ধীরে আমার চিন্তার বাহিরে চলিয়া গেলেন; তাঁহারা যে একই প্রকোষ্ঠে আমার সহিত একাসনে উপবিষ্ট, তাহা পর্য্যন্ত আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

কতক্ষণ এ ভাবে গিয়াছিল তাহা আমি বলিতে পারি না, সন্ন্যাসী মহাশয়ও আমাকে ডাকেন নাই। হঠাৎ একটা ষ্টেসনের একজন কুলী বিকৃতস্বরে সজোরে সেই ষ্টেসনের নাম হাঁকিতেই আমার চমক্ ভাঙ্গিল; আমি তাড়াতাড়ি গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বসিলাম, এবং কেমন একটু অপ্রস্তুত হইয়া সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলাম, "কি বল্‌ছিলেন?" তিনি বলিলেন "কৈ, কিছু না," আমি আরও একটু বেশী অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু যখন আপনা হইতেই কথা আরম্ভ করিয়াছি, তখন আর চুপ করিয়া থাকা ভাল দেখায় না, সুতরাং আমি তাঁহাকে দুই চারিটি কথা জিজ্ঞাসা করিলাম; তিনিও যথাযথ জবাব করিলেন। তিনি কলিকাতাবাসী; পিতামাতা কেহই নাই; নিতান্ত আত্মীয়ের মধ্যে একটি ভগিনী আছেন; তিনি সধবা; কলিকাতাতেই কোন এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থের গৃহে তিনি বিবাহিতা। তাঁহার নিজের সম্বল এই শিশু পুত্র

অমরনাথ। তাহাকে কোলে লইয়া তিনি তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছেন; বিষয় আশয় সমস্তই ভগিনীপতির হাতে দিয়া আসিয়াছেন; সে সম্বন্ধে তাঁহার কিছুমাত্র চিন্তা নাই। তাঁহার সমস্ত কথাবার্ত্তার সারোদ্ধার করিলে এই সংবাদগুলি অবগত হওয়া যায়। আমি দেখিলাম ভদ্রলোক কথাগুলি উপর উপর মাত্র বলিয়া গেলেন। এ কথাগুলি জানিবার আমার তেমন আগ্রহও ছিল না। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে লাগিলাম সন্ন্যাসীর হৃদয়ের মধ্যে প্রকাণ্ড এক আগ্নেয়গিরি। পরম প্রিয়তমা প্রণয়িনীর মৃত্যুতে সংসার ত্যাগ অনেক দেখিয়াছি, তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে তাহা বেশ বুঝা যায়; কিন্তু এই দেবোপম সুন্দর যুবক সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসের মধ্যে, প্রণয়িনী-বিয়োগের মধ্যে যেন আরও কিছু আছে; তাহারই প্রবল তাড়নায়, তাহারই অগ্নিময় স্মৃতির মর্ম্মভেদী দংশনে ভদ্রলোক ঘর ছাড়িয়া ছুটিয়া বাহির হইয়াছেন। এ ব্যাপার আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। আমার জানিবার ইচ্ছা ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিয়া গেল; তাঁহার জীবনের কাহিনী শুনিতে না পারিয়া যেন আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। আমি স্পষ্ট বাক্যে তাঁহাকে বলিয়া ফেলিলাম, "মহাশয়, মাপ করিবেন; আপনি আমাকে যে সংবাদ কয়েকটি দিলেন, আমি তাহা শুনিবার জন্য বিন্দুমাত্রও উৎসুক ছিলাম না; যে দুঃখে, যে নিদারুণ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া আপনি গৃহত্যাগ করিয়াছেন, তাহারও কথঞ্চিৎ আমি প্রাণে অনুভব করিতে পারিয়াছি; কিন্তু বলিতে কি, আপনার বুকের ভিতরে প্রকাণ্ড এক অগ্নিকুণ্ড আমি স্পষ্ট দেখিতেছি। আমার কাছে গোপন করিবেন না; আমিও আপনার ন্যায় দুঃখী। সমদুঃখীর নিকট নিজের দুঃখ-কাহিনী বলিলে কষ্টের অনেক লাঘব হয়, তাহা কি আপনি জানেন না?" আমি আর অধিক

বলিতে পারিলাম না ; তিনি এমনই কাতরনয়নে আমার দিকে চাহিলেন যে, আমার কথা বলিবার শক্তি লোপ হইয়া গেল ; আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। আমাকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া তিনি অতি মৃদু মধুর স্বরে বলিলেন "ভাই, তোমাকে আমার হৃদয়ের যন্ত্রণার কথা বলিব, কিন্তু আজ নহে। আমার কি হইয়াছে, আমি মুখে সে কথা সব বলিতে গেলে স্থির থাকিতে পারি না ; আমার মাথার ভিতরে কেমন একটা গোল হইয়া যায় ; কথা কিছুই বলা হয় না। তোমার ঠিকানা আমাকে বলিয়া যাও ; আমি তোমার সঙ্গে দেখা করিব ; তখন সব শুনিও।" এমনই সুন্দর ভাবে এই কয়টি কথা তিনি বলিলেন যে আমি দ্বিরুক্তি করিতে পারিলাম না।

এমন সময়ে কোন একটী বড় ষ্টেসনে আসিয়া গাড়ী লাগিল, এবং একজন লালা সাহেব তিন চারিটি সঙ্গী এবং কতকগুলি গাঁটরী লইয়া আমাদের প্রকোষ্ঠে উঠিয়া বসিলেন ; আমরা দুইটি প্রাণী একেবারে এক কোণে গিয়া পড়িলাম। আমাদের কথোপকথন বন্ধ হইয়া গেল। দিল্লীযাত্রী লালা সাহেবের মামলা মোকদ্দমা, ঘর গৃহস্থালীর কথা-বার্ত্তায়, ধনের গরিমায়, প্রতাপের হুঙ্কারে গাড়ীর প্রকোষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল। আমরা দুইটী গৃহহীন শ্মশানবাসী দুঃখী বাঙ্গালী গৃহস্থের এই সংসার-অভিনয় সভয়ে, সসঙ্কোচে দেখিতে লাগিলাম! লালাজির দৃষ্টি অবশেষে আমাদের উপর পতিত হইল।

সমস্ত ভারতবর্ষে একটি জিনিস্রের প্রভাব বড়ই বেশী ; তাহার নিকট রাজার উন্নত মস্তকও অবনত হয়, কৃপণের গৃহদ্বারও তাহার নিকটে উন্মুক্ত হয় ;—সে দ্রব্য আর কিছুই নহে—গৈরিক বসন। আমার সঙ্গী সন্ন্যাসীর গৈরিক বসনের উপর যখনই লালাজির দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল,

তখনই সেই ভারত-বিজয়ী গৈরিক তাহার নিকট হইতে একটি সসম্ভ্রম প্রণাম আদায় করিল। গৈরিকধারী মহামূর্খ হইলেও সেই রঞ্জিত বস্ত্রখণ্ড তাহাকে মহাপণ্ডিত পদবীতে উন্নীত করিয়া দেয়; এবং কত ছাত্র বহু বৎসর গুরুগৃহে বাস করিয়া, কত রাত্রি অধ্যয়নে কাটাইয়াও যে উপাধি লাভ করিতে অকৃতকার্য্য হইয়া বিষণ্ণ মনে গৃহে প্রস্থান করে, এই বস্ত্রখণ্ড নিমেষের মধ্যেই একজন 'ক'-অক্ষর-জ্ঞানবর্জ্জিত ব্যক্তিকে সেই মহা-সম্মাননীয় অনারারী উপাধি—"সরস্বতী" দিয়া বসে। গৈরিকের এমনই মাহাত্ম্য। আমার সঙ্গী সন্ন্যাসী কতদূর বিদ্বান্, তাহা যদিও আমি জানিতে পারি নাই, তবুও এটা বেশ বুঝিয়াছিলাম যে তিনি সরস্বতী নহেন, আমাদের মত একটা মানুষ। কিন্তু লালাজি তাঁহাকে একেবারে 'সরস্বতী' বলিয়া সম্বোধন করিয়া স্তুতি মিনতি করিতে লাগিল। তামাক সাজা হইলে সর্ব্বাগ্রেই সন্ন্যাসীকে দিতে গেল, কিন্তু সন্ন্যাসী যখন বলিলেন যে তিনি কোন প্রকার নেশা করেন না, তখন লালাজী অবাক্ হইয়া গেল; তাহার এই ৪৫ বৎসরব্যাপী লালা-জীবনে গঞ্জিকাবিরোধী সাধু সন্ন্যাসী সে কখনও দেখে নাই; এ সরস্বতী কিনা "ছিলুম ভি নেহি পিতা" হয় ত এই একটি বিষম ত্রুটিতেই সন্ন্যাসী মহাশয়ের সরস্বতী উপাধি অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর আমিও যখন তাহার কলিকাটির সদ্ব্যবহার করিতে অস্বীকার করিলাম, তখন সে বড়ই কেমন হইয়া গেল। সন্ন্যাসীও গাঁজা তামাক খায় না, তার চেলাও (আমাকে হয় ত তাহাই ঠিক করিয়াছিল) তাই; এ এক মন্দ ব্যাপার নহে। তাহার পর যতক্ষণ আমরা গাড়ীতে ছিলাম, লালাজী আমাদের সঙ্গে খুব বেশী আগ্রহের সহিত মোটেই কথা বলে নাই।

গাড়ী গাজিয়াবাদ ষ্টেসনে পৌঁছিল; আমাদিগকে এই স্থানে গাড়ী

বদল করিতে হইবে। আমরা এই স্থান হইতে নর্থ ওয়েষ্টারণ রেলওয়ের আরোহী হইব। আমি নারিকেল ও গুড়ের বস্তা লইয়া দ্বিতীয় গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম; সন্ন্যাসীও অমরনাথকে লইয়া আমার গাড়ীতে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে জিনিষ পত্র অতি সামান্যই ছিল।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল; আমরা এবার আবার একাকী হইলাম, আমাদের গাড়ীতে আর কেহ উঠিল না। সন্ন্যাসীর সঙ্গে নানা প্রকার গল্প হইতে লাগিল; সে সব কথার সঙ্গে তাঁহার জীবনের অনেক সম্বন্ধ থাকিলেও আমি যে সংবাদ চাহি, তাহার কোন কথাই তাহাতে নাই; সুতরাং সে সব কথা পাঠকগণকে জানাইবার বিশেষ কোন দরকার দেখিতেছি না।

সন্ন্যাসীর বরাবর সাহারণপুর পর্য্যন্তই যাইবার কথা; কিন্তু অমরকে ক্ষুধায় কাতর দেখিয়া তিনি মিরাট ষ্টেসনে নামিবার অভিপ্রায় করিলেন। আমার সঙ্গে পরের বোঝা না থাকিলে আমিও তাঁহার সঙ্গেই নামিয়া পড়িতাম। মিরাটার গাড়ী হইতে নামিবার সময়ে তিনি আমার হাত ধরিয়া অতি দুঃখকাতর-স্বরে বলিলেন, "ভাই, তোমার সঙ্গে আমার আবার দেখা হইবে; তখন আমার জীবনের কথা তুমি শুনিতে পাইবে।" আমি অমরকে কোলে লইয়া বুকে চাপিয়া ধরিলাম। তাহার সেই কোমল দেহ আমার শরীরে লাগিয়া যেন আমার বুক শীতল হইয়া গেল। তখন মনে হইল আমার যখন বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইতেছিল তখন যদি অন্ততঃ আমার সেই ১৪ দিনের মেয়েটি বাঁচিয়া থাকিত তাহা হইলে আর এমন করিয়া পথে পথে বেড়াইতাম না। গাড়ী ছাড়িবার সময় হইল; সন্ন্যাসী অমরকে লইয়া ধীরে ধীরে ষ্টেসনের বাহিরে চলিয়া গেলেন। আমি একাকী কত কি চিন্তা করিতে লাগিলাম।

গাড়ী সাহারণপুরে আসিল; আমি গুড় ও নারিকেল সহ বন্ধুগৃহে প্রতিষ্ঠিত হইলাম। আদর আপ্যায়ন যথারীতি হইল; সেদিন সেখানেই অবস্থান। পরদিন প্রত্যূষে এক অনিন্দ্যসুন্দর যান—এক্কা আসিয়া হাজির হইল। আমি তাহাতে উঠিয়া বসিলাম; বন্ধুগণের সস্নেহ সম্ভাষণ, প্রীতি-পূর্ণ দৃষ্টির মধ্য হইতে এক্কাপ্রবর নাচিতে নাচিতে বাহির হইয়া গেলেন। বেলা সাড়ে তৃতীয় প্রহরে তিন ভাগ জীবনী-শক্তি এক্কায় রাখিয়া আমি প্রাণে প্রাণে দেরাহুনের বাসায় পৌঁছিলাম।

দেরাহুনে পৌঁছিয়া প্রতিদিনই সন্ন্যাসী বা তাঁহার সংবাদের জন্য পথ চাহিয়া থাকি। কবে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, কবে অমরনাথকে আবার দেখিব, এই চিন্তা সর্ব্বদাই আমার মনে হইত।

একদিন অপরাহ্নকালে, বোধ হয় শুক্রবার হইবে, আমি ভ্রমণ শেষ করিয়া বাজারের,নিকট দিয়া আসিতেছি এমন সময়ে চিত্রবিচিত্র বস্ত্র-পরিহিত টেলিগ্রাফের পেয়াদা আমার হাতে একখানি লাল রংএর লেফাফা দিল। কালে কস্মিনে, কদাচিৎ এক আধ খানি তারের খবর পাই, আর তাহাতে অশুভ বই শুভ সংবাদ প্রায়ই থাকে না; কাজেই তারের খবর শুনিলেই কেমন যেন বুকের মধ্যে ধড়কড় করিয়া উঠে। তাড়াতাড়ি পত্রখানি খুলিয়া দেখি, সন্ন্যাসী হরিদ্বার হইতে টেলিগ্রাফ পাঠাইয়াছেন; তাহাতে ঠিক এই কয়েকটি কথা লিখিত ছিল 'Amar taken away by sister, alone, come to Harkipari", সন্ন্যাসী নিজেকে সন্ন্যাসী বলিয়াই সহি করিয়াছে। 'হরকিপাড়ি' কথাটা হয় ত অনেকে না বুঝিতে পারেন। হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাট আছে; সেই ঘাটেই যাত্রীরা স্নান করে; সেই ঘাটেরই নাম 'হরকিপাড়ি'।

আমি এই সংবাদ পাইয়াই তৎপরদিন হরিদ্বারে রওনা হইলাম।

দেরাদুন হইতে একখানি এক্কা ভাড়া করিয়া প্রত্যূষেই যাত্রা করিলাম এবং অপরাহ্ণ প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময়ে হরিদ্বার পৌঁছিলাম। সন্ন্যাসী মনে মনে বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার সংবাদ পাইবামাত্র আমি এব দণ্ডও অপেক্ষা করিব না; তাই তিনি যে দিন আমার আগমন প্রতীক্ষ করিতেছিলেন। তিনি সেখানে একটা, ক্ষুদ্র ঘর ভাড়া লইয়া আছেন। আমিও সেই স্থানেই তাঁহার অতিথি হইলাম।

আমি অপরাহ্ণে হরিদ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলাম। ব্রহ্মকুণ্ডের উপরেই একটা দ্বিতল অট্টালিকার দ্বিতলস্থ একটী ক্ষুদ্র কামরা সন্ন্যাসী ভাড়া লইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত সেই স্থানেই রহিলাম। আমি নিজের সঙ্গে কিছুই লই নাই; গ্রীষ্মকাল, বিছানাপত্রের বিশেষ দরকার ছিল না। বিশেষতঃ সন্ন্যাসীকে তৎপরদিন দেরাদুনে জোর করিয়া লইয়া আসিব ইহাই আমার সংকল্প ছিল। সন্ন্যাসীর বাসগৃহে কোন দ্রব্যই দেখিলাম না; সেখানে যে কেহ বাস করে তাহার চিহ্ন মাত্রও নাই। জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলাম, সন্ন্যাসী দুই প্রহরে কোন এক সদাব্রতে গিয়া উপস্থিত হন; সেখানে যে রুটী, দাইল, তরকারী পান, তাহার দ্বারা গঙ্গাতীরে বসিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করেন; কমণ্ডলুটি ছিল, তাহাও হারাইয়া গিয়াছে; করপুটে গঙ্গাজল পান করেন। পথে পথে জঙ্গলে জঙ্গলে সারাদিন ভ্রমণ করেন, সন্ধ্যার সময়ে ক্লান্ত শরীরে আসিয়া এই গৃহটীর মধ্যে হস্ত পদ বিস্তৃত করিয়া পড়িয়া থাকেন; কখনও নিদ্রা হয়, কখনও হয় না। অমর যে কয় দিন তাঁহার সঙ্গে ছিল, সে কয় দিন আর তিনি এমন করিয়া ভ্রমণ করিতে পারিতেন না; তাহার জন্য সন্ন্যাসীর প্রবল উদ্দাম ভাব অনেকটা সংযত হইয়াছিল। আমার মনে হইল ছেলেটীকে তাঁহার আত্মীয়গণ লইয়া গিয়া ভাল করেন নাই; হয় ত

ছেলেটীর অসুবিধা হইতেছে দেখিয়া সন্ন্যাসীর মনে আবার গৃহের দিকে টান হইত।

যাহা হউক রাত্রে আমার কি আহার হইবে তাহারই চিন্তায় সন্ন্যাসী কাতর হইলেন। আমি তাঁহাকে নিশ্চিন্ত হইতে বলিলাম এবং তাঁহাকে সেখানে রাখিয়া বাজার হইতে সামান্য কিছু খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনিলাম। অনেক জেদ করিতে তিনি সামান্য কিছু আহার করিলেন, আমিও জলযোগ করিলাম। 'জলযোগ' কথাটা ভুল হইল; কারণ জলের সঙ্গে যোগ সাধন করিতে আমাদিগকে গঙ্গায় নামিতে হইয়াছিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমরা এই গঙ্গাতীরেই খানিকক্ষণ উপবেশন করি।" আমি বুঝিলাম, এই কলনাদিনী জাহ্নবীর তীরে, সম্মুখে ঐ অভ্রভেদী হিমালয়, মস্তকোপরি চন্দ্রনক্ষত্রখচিত নীলাকাশ, চারিদিকে প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্য,—এই সব দেখিয়া হয় ত তাঁহার মন কথঞ্চিৎ শান্ত থাকে; তাই তিনি এখানে বসিতে বলিলেন। আমরা কুশঘাটের উপরে গিয়া বসিলাম; কারণ ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে সর্ব্বদা জনতা লাগিয়াই আছে।

ঘাটে গিয়া দুই জনেই বসিলাম বটে, কিন্তু কি বলিয়া কি কথা আরম্ভ করিব, তাহা কিন্তু আমি খুঁজিয়া পাইলাম না। এমনই ভাবে ৫।৭ মিনিট কাটিয়া গেল; শেষে সন্ন্যাসী আপনা হইতে বলিলেন "ভাই, তুমি আমার দুঃখকাহিনী শুনিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছ; তোমাকে আর কষ্ট দিব না। সব বলিতেছি। তোমাকে তুমি বলিয়া ডাকিতেছি, তাহাতে দুঃখিত হইও না; আমি যাহাকে ভালবাসি তাহাকে আপনি বলিয়া ডাকি না।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী কেমন অন্যমনস্ক হইয়া রহিলেন। আমি স্থির করিলাম, নিজে কোন প্রকার ঔৎসুক্য দেখাইব

না, বা কোন প্রশ্নও করিব না; সন্ন্যাসী আপনা হইতে যাহা বলেন তাহাই শুনিব।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "দেখ, তোমার নিকট দুইটি ব্যাপার গোপন করিব; একটি আমার পরিচয়, দ্বিতীয়টি আমার কলিকাতার বাড়ীর ঠিকানা। কেন, তা জান? আমি একটা সম্ভ্রান্ত পরিবারের কলঙ্কস্বরূপ। আমার পরিচয় দিয়া তোমার মনে সে পরিবার সম্বন্ধে একটা মন্দ ধারণা জন্মাইব কেন? সে পরিবারকে কলঙ্কিত করিবার অধিকার আমার নাই? কেমন? পরিচয় দেওয়া কি তুমি ভাল মনে কর?" আমি বলিলাম, "না, তুমি তোমার পরিচয় আমাকে দিও না, আমি তাহা জানিবার জন্য ব্যস্তও নহি। তোমার দুঃখকাহিনী আমাকে বল; তোমার অন্তরের জ্বালা তাহা হইলে অনেকটা কমিয়া যাইবে।" "সেই বেশ কথা"—এই বলিয়া সন্ন্যাসী আবার অন্যমনস্ক হইলেন। আমি চুপ করিয়া রহিলাম। "না, এইবার আমি মনকে ঠিক করিয়াছি; তোমাকে সব বলিতেছি" বলিয়া সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমি দেখিলাম, হয় ত সন্ন্যাসী উন্মত্ত হইয়া উঠিবেন, কাজেই আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, "না, তোমার কাহিনী আমার শুনিয়া দরকার নাই; চল ঘরে ফিরিয়া যাই, রাত্রি হইতেছে।"—সন্ন্যাসী আমার মনের ভাব বুঝিল, অতি ধীরে বলিল, "ভাই, বিরক্ত হই না, আমি সব বলিতেছি। আজ পাঁচ বৎসর হইল কলিকাতার এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থের একটি সুন্দরী কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়, তখন আমার মা বাঁচিয়া ছিলেন। আমাদের অবস্থা তখন বেশ ছিল, এখনও তেমনিই আছে। আমি তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ি। যখন বিবাহ হয় তখন আমার স্ত্রীর বয়স পনর বৎসর, আমার বয়স

তখন তেইশ বৎসর। যৌবন, বয়স, কবিতাময় জীবন, উন্নত অবস্থা,—আমি তখন স্বপ্নরাজ্যে বেড়াইতাম; আমাকে তখন যদি কেহ স্বর্গে যাইবার জন্য অনুরোধ করিত, আমি তাহাতেও অসম্মত হইতাম,—স্বর্গেও বুঝি এত সুখ মিলিত না। আমি বি-এ পাশ করিলাম, এম, এ পরীক্ষা দেওয়া হইল না। বাড়ীতেই বসিয়া থাকি, আর সৌন্দর্য্যের রাজ্যে ভ্রমণ করি। বিবাহের দেড় বৎসর পরে অমর জন্মগ্রহণ করিল। আমাদের সুখ ষোলকলায় পূর্ণ হইল। কিন্তু কে জানিত যে, এত সুখেও আমাদের দুঃখ আসিবে। তারপর কি হইল জান? আজ পাঁচ ছয় মাস পূর্ব্বে আমার স্ত্রীর অত্যন্ত জ্বর হয়, জীবনসংশয় হইয়াছিল; অনেক যত্নে, অনেক চেষ্টায়, অনেক অর্থব্যয়ে তাঁহার জীবনরক্ষা হয়; কিন্তু তাঁহার শরীর এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে, ডাক্তারেরা সকলেই বায়ুপরিবর্ত্তনের পরামর্শ দেন। আমি তদনুসারে সপরিবারে—যাই। স্থানটির নাম তোমাকে বলিলাম না। যেখানে গেলাম, সে স্থানটি উত্তরপশ্চিম প্রদেশ হইলেও সেখানে অনেক বাঙ্গালী বাস করেন। যদিও সে সময়ে স্থান-পরিবর্ত্তন জন্যই আমার স্ত্রীর শরীর ক্রমে একটু করিয়া সুস্থ হইতেছিল, তবুও একজন চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে তাঁহাকে রাখা আমি কর্ত্তব্য মনে করিলাম। সেই সহরে অনেক নামওয়ালা ডাক্তার ছিলেন বটে, কিন্তু আমার একজন বাঙ্গালী বন্ধু বলিলেন "এখানে একজন নেটিব ডাক্তার আছেন। তিনি যদিও ক্যাম্বেল স্কুলের পাশ এবং তাঁহার বয়স যদিও কম, কিন্তু তাঁহার চিকিৎসা সম্বন্ধে বড়ই সুনাম এবং তিনি অতিশয় সচ্চরিত্র সাধু ব্যক্তি। বড় বড় ডাক্তারেরা আসিয়া পদধূলি প্রদান করিয়াই বড় বড় দর্শনী লইয়া চলিয়া যান; ছোট রকমের ডাক্তারগণ তাহা করেন না; বিশেষ কোন অবস্থাপন্ন লোক যদি তাঁহা-

দিগকে কোন চিকিৎসার জন্য ডাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা বিশেষ যত্ন করিয়াই দেখেন।"

ডাক্তার বাবু আসিলেন; দিব্য গৌরবর্ণ পুরুষ, চক্ষে সোনার চসমা আছে; কথায় বার্ত্তায় অতি বিনয়ী, বয়স বোধ হয় ২৩।২৪ বৎসর হইবে। তাঁহাকে পাইয়া আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। আমার স্ত্রীর অবস্থার কথা বলিলাম এবং তাঁহার দ্বারা পরীক্ষাও করাইলাম। প্রথম দর্শনেই ডাক্তারের প্রতি আমার একটা অনুরাগ জন্মিয়াছিল; তাঁহাকে প্রত্যহ দুই বেলাই আমার বাসায় আসিতে অনুরোধ করিলাম; তিনিও সম্মত হইলেন। এই ভাবে ১০।১৫ দিন যায়; আমার স্ত্রীর শরীরও প্রায় সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া আসিয়াছে। তবুও আর দুই এক মাস আমরা সেইখানেই থাকিব স্থির করিলাম।

"এই সময়ে একদিন আমি প্রাতর্ভ্রমণ করিয়া বাসায় ফিরিতেছিলাম। আমার বাসার অন্তর্গত একটা ছোটখাটো রকমের ফুলবাগান ছিল; সেটা অন্দরের দিকেও, বাহিরের দিকেও। আমি যখন বাসার মধ্যে প্রবেশ করিব তখন দেখি ডাক্তার সেই বাগানের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন এবং ঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া আমার স্ত্রী তাঁহার সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া কি কথা বলিতেছেন। এ দৃশ্য দেখিয়াই আমার মাথা ঘুরিয়া গেল, 'সন্দেহ' রাক্ষসী আমার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। আমি তাড়াতাড়ি বারান্দায় গিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। তাহার একটু পরেই ডাক্তার আসিয়া আমার কাছে যথারীতি বসিলেন এবং আমার মুখ বিবর্ণ দেখিয়া কোন অসুখ হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। "শরীরটা তেমন ভাল বুঝিতেছি না, তবে বিশেষ কিছু অসুখ হয় নাই" এইমাত্র বলিয়া ডাক্তারের কথার জবাব দিলাম। ডাক্তার চলিয়া

গেলেন। আমার মনের তখন যে প্রকার অবস্থা তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, তোমাকে তাহা বুঝাইবার আমার সাধ্য নাই। আমার মনে হইতে লাগিল, এই দণ্ডেই বজ্রপতনে আমার প্রাণান্ত হইলে বাঁচিয়া যাই!

"আমি কোন দিন বেড়াইয়া আসিয়া এ অবস্থায় বসিয়া থাকি না; সে দিন আমাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া সকলেই চিন্তিত হইলেন। আমার অসুখ হইয়াছে বলিয়া আমি বিছানায় শয়ন করিলাম, এবং কেহ যেন আমার বিশ্রামের ব্যাঘাত না জন্মায় তাহাও বলিয়া দিলাম। এ আদেশ যে আমার স্ত্রীর উপরেও খাটিতে পারে, তাহা তিনি কি করিয়া বুঝিবেন? আমার স্ত্রী আসিয়া আমার বিশ্রামের ব্যাঘাত জন্মাইলেন; প্রতিদিন যেমন সহাস্যবদন আজও তাই; তাঁহার ভাবের কোন বৈলক্ষণ্যও দেখিলাম না। আমি ভাবিতে লাগিলাম স্ত্রীলোকের হৃদয় কি ভয়ানক! তখনই ডাক্তারের সহিত তাহার সেই আলাপের কথা মনে হইল; মনে হইল ভগবান কেন এমন রাক্ষসীদলকে পৃথিবীতে মানুষের যন্ত্রণাবৃদ্ধির জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন! আমি অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করিলাম। অনেকক্ষণ শয়ন করিয়া থাকিলাম, আমার স্ত্রী আমাকে বিশেষ অসুস্থ মনে করিয়া ডাক্তার ডাকিতে চাহিলেন, আমি নিষেধ করিলাম। সেই দিন অপরাহ্নে আদেশ প্রচার করিলাম, আগামী কল্য আমরা কলিকাতায় ফিরিয়া যাইব। হঠাৎ আমাদের এই মত পরিবর্ত্তনের সংবাদে সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন। আমার শরীর বড় ভাল নয়, এই কারণ দর্শাইয়া পরদিনই আমরা সকলেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

"ভাই! ইহার পরে যে সব ঘটনা হইয়াছিল, তাহা তোমাকে অতি

সংক্ষেপে বলিব ; সে সব কথা ভাল করিয়া গোছাইয়া বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমরা প্রাতে হাবড়া ষ্টেসনে পৌছি। বাড়ীতে পৌছিয়া গোলমালেই দিন কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার পরে আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। আমার শুধু মনে হইতে লাগিল অসতী সহবাস অসহ্য ! এ দারুণ যন্ত্রণা যে কাহারও কাছে প্রকাশ করিবারও উপায় নাই। কি করি ! শেষে আমি পাগলের মত হইয়া পড়িলাম, আমার জ্ঞান লোপ হইল ; অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া আমার স্ত্রীকে ডাকিয়া প্রকাশ্য-ভাবে তাহাকে সমস্ত কথা বলিলাম, শুনিয়া সে কোন জবাব দিল না ; শেষে বৈদ্যুতিভরা নিদাঘজলদের ন্যায় সে ধীরে ধীরে ঘরের বাহির হইয়া গেল। আমিও আর স্থির থাকিতে না পারিয়া পথে বাহির হইয়া পড়ি-লাম। প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া পথে ঘুরিয়া যখন বাড়ী আসিয়া উপরে যাইতেছি, তখন একজন দাসী আসিয়া সংবাদ দিল "সর্ব্বনাশ, বৌমার কি হইল, তিনি মাটিতে লুটাইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছেন, মুখ নীল হইয়া গিয়াছে।" এই সংবাদ শুনিয়া তাড়াতাড়ি আমি তাহার শয়নকক্ষে গেলাম ; দেখি ঘরের মেজেয় পড়িয়া আমার স্ত্রী ছট্‌ফট্ করিতেছে। আমাকে দেখিয়া সে একবার উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল, তখন তাহার জীবনের সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছিল, সে উঠিতে পারিল না ; ইঙ্গিতে আমাকে নিকটে ডাকিল; আমার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া শুধু একটি কথা বলিল "বিশ্বাস কর, আমি নিরপরাধা।" তার পরেই তাহার নয়নতারকা স্থির হইল ; সব শেষ হইয়া গেল। তাহার চিকিৎসার জন্য অবসর পাই-লাম না। আমি স্থিরভাবে বসিয়া এই অন্তিম দৃশ্য দেখিলাম, অকস্মাৎ আমার দৃষ্টি তাহার বক্ষের দিকে পড়িল। বোধ হইল তাহার অঞ্চলে কি বাঁধা আছে, আর সে দৃঢ়মুষ্টিতে তাহা ধরিয়া আছে। অনেক কষ্টে হাত

ছাড়াইয়া অঞ্চল খুলিয়া দেখিলাম, একখানি পত্র। তাড়াতাড়ি পত্র খুলিয়া যাহা পড়িলাম, এ জীবনে তাহা ভুলিব না। ভাই, তোমাকে সংক্ষেপে বলি, সে ডাক্তার আমার শ্বশুরের অন্নে প্রতিপালিত; ডাক্তারী পাশ করিয়া ঐ সহরে ব্যবসায় করিতেছে। প্রথমে আমাদিগকে চিনিতে পারে নাই; আমার স্ত্রী প্রথম তাহাকে চিনিতে পারে এবং যে দিন আমি তাহাদিগকে বাগানে কথা বলিতে দেখি, সেই দিনই প্রথম আমার স্ত্রী তাহাকে ডাকিয়া কথা বলে। আমরা যতদিন ওখানে ছিলাম, আমার স্ত্রীর মনে ডাক্তার সম্বন্ধে সন্দেহ হইত, কিন্তু সে কথা সে কাহাকেও বলে নাই। সেই দিন প্রাতঃকালে ঝির দ্বারা তাঁহার পরিচয় লয় এবং তাহার সন্দেহ ভঞ্জন হয়। সেই দিনই আমাকে সে কথা আমার স্ত্রী জানাইত; কিন্তু যখন বলিতে আসিতেছিল তৎপূর্ব্বেই আমার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছিল। আমি কি করিয়াছি বুঝিতে পারিলে? এই দেখ আমি স্ত্রী-হন্তা; এই দেখ আমি এক নিরপরাধা অবলার প্রাণ সংহার করিয়াছি; এই দেখ—" বলিয়া সন্ন্যাসী লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক দশ হাত সরিয়া গেল। তাহার উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার হাত ধরিলাম, দেখি সংজ্ঞা নাই। অঞ্জলি পূরিয়া গঙ্গার জল আনিয়া মুখে চোখে দিতে লাগিলাম; অনেকক্ষণ পরে সন্ন্যাসীর চেতনা হইল। তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে। ধীরে ধীরে দুইজনে তাহার বাসগৃহে আসিলাম; নীরবে গৃহতলে দুইজনে শয়ন করিলাম; দুইজনেই গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, অজ্ঞাতসারে নিদ্রা আসিয়া আমাকে অধিকার করিয়া ফেলিল। প্রাতঃকালের সূর্য্যালোক যখন ঘরে প্রবেশ করিয়াছে, তখন আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিয়া দেখি সন্ন্যাসী সেখানে নাই, মনে করিলাম বাহিরে বেড়াইতে গিয়াছে। ক্রমে বেলা হইল, তখনও তাহার দেখা নাই। আমি বাহির হইলাম, চারিদিকে

অনুসন্ধান করিলাম। হরিদ্বারের সমস্ত স্থানই আমি জানি, প্রায় সকল স্থানেই দেখিলাম, কোথাও তাহাকে পাইলাম না। ক্লান্ত হইয়া সেই নির্জ্জন গৃহে ফিরিলাম। সেখানেও সে নাই। অপরাহ্নে আবার খুঁজিতে বাহির হইলাম—নিরাশ হইলাম। দুইদিন হরিদ্বারে থাকিয়া চারিদিকে দেখিলাম, তাহার কোন উদ্দেশ পাইলাম না। শেষে নিরাশহৃদয়ে দেরাদুনে ফিরিয়া আসিলাম।

তাহার পর কত স্থানে কত দিন ভ্রমণ করিয়াছি, সন্ন্যাসীর কথা কোন দিন ভুলিতে পারি নাই; তাহার একমাত্র নয়নপুত্তলি অমরের কথা যেন আমার জীবনের সহিত বিজড়িত হইয়া গিয়াছিল! এই সংসার-সাগরের উন্মত্ত তরঙ্গে ভাসমান বৃন্তচ্যুত কুসুমতুল্য দুইটী হতভাগ্যের ব্যথিত জীবন এক সমুজ্জ্বল শারদ মধ্যাহ্নে আমার এই আশাস্খলিত, উদ্দেশ্যহীন আকাঙ্ক্ষাপীড়িত শুষ্ক জীবনের সংস্রবে আসিয়া আমার হৃদয়ের উপর কি আকর্ষণজাল বিস্তার করিয়াছিল, প্রথমে আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই। বহুস্থানে আমি তাহাদের অন্বেষণ করিয়াছি।

কিন্তু আর তাহাদের দেখিতে পাইলাম না। এই মহানগরী কলিকাতায় আসিয়াও অনুসন্ধানের ক্রটী করি নাই; পথে চলিতে চলিতে কতদিন কতবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়াছি—যদি একবার তাহাদের দেখিতে পাই!—কিন্তু আর দেখিতে পাইলাম না। ইচ্ছা ছিল, একবার শুনি সন্ন্যাসী দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন কি না। সুদীর্ঘকালব্যাপী কঠোর প্রায়শ্চিত্তের পর তাঁহার হৃদয় সংযত হইয়াছে কি না! কিন্তু আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না।

এইভাবে অনেক দিন কাটিয়া গেল। বর্ষাকালে একদিন অপরাহ্নে আমি ভাগীরথী তীরবর্ত্তী আমাদের দ্বিতলস্থ বারান্দায় একখানি আরাম-

কেদারার উপর দেহভার প্রসারিত করিয়া একবার ভাগীরথীর বিস্তীর্ণ বক্ষে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছি, একবার বা পরপারস্থ ধূসর বনরাজির দিকে চাহিয়া দেখিতেছি, আকাশে মেঘ ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে, এবং আর্দ্র উদ্দাম বায়ুপ্রবাহে প্রতি মুহূর্ত্তে আসন্ন বৃষ্টির সম্ভাবনা পরিব্যক্ত হইতেছে; এমন সময়ে দেখিলাম, একখানি দ্রুতগামী পিনেসের উপর বসিয়া একটী লোক,—ঠিক আমার সেই পূর্ব্ব-পরিচিত সন্ন্যাসীর মত। একলম্ফে উঠিয়া রেলিংএর কাছে আসিলাম, মস্তক প্রসারিত করিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম; দেখিতে দেখিতে নদীর খর স্রোতে পালভরে পিনেস্‌খানি আমার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিল। এ কি আমার সেই সঙ্গী সন্ন্যাসী? এমন সময়ে তিনি মেঘ ও বৃষ্টি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া বর্ষার তরঙ্গ-ভঙ্গ-ভীষণা ভাগীরথী-প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে কোথায় যাইতেছেন? কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সন্ন্যাসী একাকী, তাঁহার প্রাণাধিক পুত্র অমর কোথায়? সে কত বড় হইয়াছে! আর হয় ত তাহাকে দেখিব না। আমি স্থান কাল ভুলিয়া সেই রেলিংএ ভর দিয়া দাঁড়াইয়া অতীতের শত দৃশ্য কল্পনানেত্রের সম্মুখে উদ্ভাসিত দেখিলাম। দেখিতে দেখিতে নদীর অপর পার অন্ধকার হইয়া আসিল, সমস্ত আকাশ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘে আচ্ছন্ন হইল, প্রবল বেগে বৃষ্টিধারা পড়িতে লাগিল। সেই ঘনান্ধকার-পূর্ণ বর্ষার অপরাহ্লে, নদীকূলে, এক নির্জ্জন গৃহের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আকাশ ও পৃথিবীর সেই ধারাবর্ষণের মধ্যে আমার অনুমান হইল একটি শান্তিহীন অভিশপ্ত অনাথ তাহার অনুতাপদগ্ধ হৃদয়ভার বক্ষে বহিয়া লক্ষ্যহীন ভাবে কোন্ অনির্দ্দিষ্ট দেশে ছুটিয়া চলিয়াছে, এবং বর্ষার তীব্র বায়ুপ্রবাহে তাহার বিদীর্ণ হৃদয়ের হাহাকার ভাসিয়া আসিয়া আমার শ্রবণপথে প্রবেশ করিতেছে।

ব্রহ্মচারিণী।

সে অনেক দিনের কথা, আজ দশবৎসরের কম নহে। আমি তখন পাটনা কলেজে এল, এ ক্লাসে পড়ি; বড় দাদা তখন পাটনা জজ আফিসের হেড ক্লার্ক। আমরা সকলেই পাটনায় থাকিতাম; মা, দিদি, বড় বৌ-দিদি, দাদার তিনটি মেয়ে, আর আমি তাঁহার পোষ্যের মধ্যে। আমাদের বাসার পাশেই উকিল হরকুমার বাবুর বাসা। হরকুমার বাবুর একমাত্র পুত্র অনুকূল আমার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়িত। পাশে বাড়ী, এক সঙ্গে পড়ি, বিদেশে আছি; সুতরাং আমাদের দুই পরিবারে খুব ভাব হইয়াছিল। মেয়েরা সর্ব্বদাই এবাড়ী ওবাড়ী যাতায়াত করিতেন। আমি আর অনুকূল দুইজনে এক সঙ্গে তাহাদের বাড়ীতেই পড়িতাম; আমাদের উঠা বসা এক সঙ্গেই হইত।

অনুকূলের একটী ভগিনী ছিল, তাহার নাম সুপ্রভা। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন সুপ্রভার বয়স বার বৎসর; হরকুমার বাবু নানা স্থানে মেয়ের বিবাহের সন্ধান করিতেছেন।

সুপ্রভাকে কিন্তু আমার বড় ভাল লাগিত; তার রূপ ভাল, কি গুণ ভাল, কাণ ভাল কি মুখ ভাল,—কি যে আমার ভাল লাগিত তাহা আমি কখনও বুঝিতে পারি নাই, আজও হয়ত ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। নভেল হিসাবে "লভ" বলিবার যাঁহার ইচ্ছা হয়, তিনি তাহাই বলিতে পারেন। আমার কিন্তু সুপ্রভাকে ভাল লাগিত; তা বলিয়া আমি কলেজের পড়া ছাড়িয়া সুপ্রভার উদ্দেশে কোন দিন কবিতা লিখি নাই; তাহার ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে এলে ফেল

করিয়া মফস্বল মাইনর স্কুলের মাষ্টারী বা মার্চ্চেণ্ট অফিসের শিক্ষা-নবিশির জন্য প্রস্তুত হই নাই ; আহার নিদ্রা কিছুরই ভিন্ন ভাব ছিল না। তবে কেমন একটু আকর্ষণ ছিল, আফিমখোরেরা যাকে মৌতাত বলে। সন্ধ্যার পরে বই কয়খানি বগলে করিয়া অনুকূলদের বাড়ী একবার করিয়া যাইতেই হইবে,—তা আকাশের বজ্রই ভাঙ্গিয়া পড়ুক, আর বাড়ীতেই হাজার কাজ থাকুক। সন্ধ্যার পর অনুকূলের পড়ার ঘরে সুপ্রভা রোজই একবার করিয়া আসিত। তাহার তখন মৌতাত ধরিয়াছিল কি না বলিতে পারি না, তবে সে আসিত। আমাদের সঙ্গে গল্প করিত ; অনর্থক নানা কথা পাড়িয়া আমাদের পড়ার ক্ষতি করিত। শেষে যখন হরকুমার বাবুর পত্নী আসিয়া রাগ করিতেন, তখন মায়ের সঙ্গে সে চলিয়া যাইত, আমরা দুইজনে ট্রিগোনোমেট্রীর "ট্যান," "কট', লইয়া বসিতাম।

এই ভাবে আমাদের দিন কাটিয়া যাইতেছিল। যেবার এল, এ পরীক্ষা দিব, সেইবার পূজার বন্ধের মধ্যে দাদার গয়ায় বদলীর সংবাদ আসিল। পাটনা ছাড়িয়া দাদাকে গয়ায় যাইতে হইল। আমি একটা ছাত্রদের মেসে থাকিব স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু হরকুমার বাবু ও তাঁহার স্ত্রী একবারে নারাজ ; অগত্যা আমি তাঁহাদের বাসাতেই থাকিলাম।

এতদিন সুপ্রভাকে ভাল লাগিত, কিন্তু তাহাদের বাড়ীতে স্থায়াভাবে আড্ডা করিবার পর হইতে সে যেন আমার হৃদয়ের খানিকটা স্থান দখল করিয়া বসিল ; সুতরাং আমার পড়া শুনার যে রুটীন ছিল তাহার মধ্যে সুপ্রভাও একটা পড়ার বিষয় হইল। সম্মুখে এল, এ পরীক্ষার প্রকাণ্ড দানব সর্ব্বদাই বিকট মুখভঙ্গী করিয়া দাঁড়াইত, আর আমি সুপ্রভার চিন্তা ছাড়িয়া ইংরেজী সাহিত্যের নোটে মনঃসংযোগ করিতাম ;

আবার ধীরে ধীরে ইংরেজী সাহিত্য হইতে মনটা সুপ্রভার দিকে যাইত। এই ভাবে আমি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলাম। নিতান্তই অদৃষ্টের জোর ছিল, আর পিতৃপুরুষদেরও বোধ করি পুণ্যবল ছিল; তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভুগণ আমাকে গলহস্তে বিদায় দিতে পারেন নাই; আমি প্রথম বিভাগেই উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম। পরীক্ষা শেষ হইলেই আমি দাদার কাছে চলিয়া গিয়াছিলাম; তাহার পরে অন্য পর্য্যন্ত আমি পাটনায় যাই নাই। আমার মনে নিজের প্রতি অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল; তাঁই পাটনায় যাই নাই। আমি বুঝিয়াছিলাম পাটনায় থাকিলে আমার পরকাল নষ্ট হইবে। অনেক কষ্টে এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলাম।

যাহা হউক, গোড়ায় একটা কথা বলিয়া রাখি। সুপ্রভার চিন্তা আমি ত্যাগ করিতে পারি নাই। মনে স্থির করিয়াছিলাম, এ জীবনে বিবাহ করিব না, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিব। কলেজে পড়িবার সময় একটু আধটুকু ভালবাসায় পড়িয়া আমার মত ব্রহ্মচারী হইবার জন্য অনেকেই প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকেন। এটা বয়সের দোষ, কি কন্দর্প ঠাকুরের দোষ কোন দিন তাহা বুঝিতে পারি নাই।

তাহার পর সাত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আমি আজ দুই বৎসর হইতে আলিপুরে ওকালতী আরম্ভ করিয়াছি। কি পাই না পাই সে কথা এত লোকের মধ্যে বলিয়া পসার মাটী করিতে রাজী নই। ভবানী-পুরে ছোট একখানি বাসা আছে, রাঁধিবার ব্রাহ্মণ আছে, একটা চাকর আছে, একজন মোহরার আছে, ভাড়াটিয়া গাড়ীতে কাছারীতে যাই। শ্বশুর অবশ্য খরচ যোগান না—আমার শ্বশুর হইবার সৌভাগ্য এখনও কোন ভাগ্যবতী কন্যার পিতার হয় নাই। সেই কলেজের ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিজ্ঞা এ সাত বৎসর রক্ষা করিয়াছি। সুপ্রভার কথা

মধ্যে মধ্যে মনে হয় বই কি? কিন্তু তাহাদের বিশেষ কোন খবর রাখি না। আমারই অনেক সময়ে মনে হয় যে, আমার প্রকৃতিটা যেন কেমন, কিছুরই সঙ্গে খাপ খায় না। দাদাও ঐ কথাই বলেন। তা কি করিব, ভগবান আমাকে এই ছাঁচেই ঢালিয়াছেন। যথাসময়ে কাছারী যাই, কাজ কর্ম্ম থাকিলে করি, আর না থাকিলে বার লাইব্রেরীতে বসিয়া খবরের কাগজ পড়ি; তাহার পর বাসায় আসিয়া পড়া শুনা করি; ছুটীর সময়ে গয়ায় দাদার কাছে যাই। মা, বৌদিদি, দিদি সকলেই অসন্তুষ্ট; আমার বিবাহের কথা কাণে না তোলা, আমার পক্ষে একটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া তাঁহারা মনে করেন।

গত পূজার বন্ধ হইবার তিন দিন পূর্ব্বে একদিন বেলা এগারটার সময় একজন ডাকপিয়ন বার লাইব্রেরীতে আসিয়া আমার অনুসন্ধান করিতেছিল। আমি তখন এক পার্শ্বে বসিয়া একখানি খবরের কাগজ পড়িতেছিলাম; আমার মত আর একজন জুনিয়ার তখন গুড়ুকে বুদ্ধি গম্ভীর করিয়া তুলিতেছিলেন। তিনি আমাকে সনাক্ত করিয়া দিলে পিয়ন আমার হাতে একখানি পত্র দিল। কাছারীর ঠিকানায় আমার কোন পত্র আসে না, সুতরাং তাড়াতাড়ি পত্রখানি লইয়া দেখি, উপরে অপরিচিত বাঙ্গালা অক্ষরে আমার নাম লেখা, ঠিকানা "জুনিয়ার উকিল, কলিকাতা, আলিপুর।" লেখা পুরুষের নয়, তাহা দেখিবামাত্রই বুঝিলাম; কিন্তু স্ত্রীলোকের মধ্যে দিদি ও বৌদিদি আমাকে পত্র লিখেন; তাঁদের হাতের লেখা আমি বেশ চিনি। আর তাঁরা এমন অদ্ভুত ঠিকানায় পত্র লিখিবেন কেন? তাড়াতাড়ি পত্রখানি হাতে করিয়া লাইব্রেরীর বারান্দায় আসিলাম। পত্র খুলিয়াই আগে লেখিকার নাম দেখিতে গেলাম। সহি রহিয়াছে "হতভাগিনী সুপ্রভা।" সুপ্রভা!

সুপ্রভা এতদিন পরে আমাকে পত্র লিখিয়াছে; আমি পত্র পড়িব কি, নিজের চক্ষুকেই বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কত কথা আমার মনে আসিল; পাটনার সমস্ত ব্যাপার এক মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার স্মৃতিপথে উদিত হইল।

একটু স্থির হইয়াই পত্রখানি পড়িতে লাগিলাম; চারি পৃষ্ঠা ভরা লেখা। পত্রখানি এই :—

"শ্রীচরণেষু! দাদা কলিকাতায় গিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে শুনিলাম, আপনি এখন আলিপুরের উকিল। সাত বৎসর আপনাকে দেখি না; হয় ত আমাদের কথা আপনার মনেও নাই। আপনি এতদিনের মধ্যে একটী বারও আমাদের সংবাদ লইলেন না। তবুও আপনাকে পত্র লিখিতেছি।

আমাদের অবস্থার কথা দাদার কাছে সব শুনিয়াছেন কি না জানি না; শুনিলেও আমার কথা কিছুই শুনেন নাই, ইহা আমি নিশ্চয় বলিতে পারি।

বাবা-মা স্বর্গে গিয়াছেন। আমাকে তাঁহারা যাঁহার হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের পাছেপাছেই স্বর্গে গিয়াছেন। সংসারে আমি এখন দাদার ভগিনী। একটী দেবর আছেন, তিনি কলিকাতায় থাকেন। তাঁদের অবস্থা বড়ই খারাপ; তাঁহারা আমার কোন সংবাদই লন না।

দাদা আর এখন সে দাদা নাই। তিনি পুরা সাহেব। দাদা যে বিলাত যান নাই, তাহা আপনি অবশ্যই জানেন। কলিকাতার এক-জন বিলাতফেরত ব্যারিষ্টারের মেয়ে আমার বৌদিদি। দাদা ওকালতী করিয়া যাহা পান, তাহাতে সাহেবী চলে না। বাবা যাহা কিছু রাখিয়া

গিয়াছেন, তাহা দিয়া ও দাদার সামান্য উপার্জ্জন দিয়া আমাদের সংসার চলে। ব্যারিষ্টারের মেয়ে পূরা মেম সাহেব; কাজেই দাদাকে সাহেব হইতে হইয়াছে। বাড়ীতে সব সাহেবী কায়দা।

আমি আজ তিন বৎসর বিধবা হইয়াছি। দুঃখ করিয়া আর কি করিব। অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহা হইয়াছে। কিন্তু আমি আর এ বাড়ীতে তিষ্ঠিতে পারিতেছি না। আমি হিন্দুর ঘরের মেয়ে, তাতে বিধবা; আমাকে ব্রত নিয়ম, একাদশী উপবাস, সবই করিতে হয়; নইলে পরকালে কি হইবে। কত পাপের ফলে এই কষ্ট পাইতেছি, তাহার পর আবার যদি পাপের বোঝা বাড়াই, তবে জন্মান্তরে অদৃষ্টে না জানি কি হইবে।

দাদা ও বৌদিদি আমার এ সব ব্রত নিয়ম দেখিতে পারেন না। তাঁহাদের ইচ্ছা আমি জামা গায়ে দিই, জুতা মোজা পরি; তাঁহাদের মত টেবিলে বসিয়া খানা খাই। হিন্দুর বিধবা, তা কি পারি ? কিন্তু দাদার ইহাতে ভারি রাগ ; বৌদিদি ত আমার মত জানোয়ারকে বাড়ীতেই রাখিতে চান্ না। আমি বলি, আমি যে তোমাদের বোন, এ কথা লোকের কাছে না বলিলেই হয়; তোমাদের দশটা দাসী আছে, আমাকেও না হয় লোকের কাছে সেই পরিচয়ই দিও; আমি তোমাদের দাসীবৃত্তি করিয়াই জীবনের কটা দিন কাটাইয়া দিব। কিন্তু তাতে তাঁরা রাগ করেন; তাঁদের বন্ধুগণ যখন আসিয়া আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত হন, তখন আমাকে তাঁদের সম্মুখে যাইবার জন্য জেদ করেন; তাঁদের সম্মুখে চেয়ারে বসিয়া তাঁদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতে বলেন। এমন কি, বৌদিদির ইচ্ছা যে, আমি আবার বিবাহ করি।

আমার যে বিপদ্; তাহা আর আপনাকে কি বলিব। আমি ভাল

লেখা-পড়া জানি না। সব কথা গোছাইয়া বলিতে পারিতেছি না। আমার প্রাণের মধ্যে যে কেমন করে, তাহা আমি কেমন করিয়া আপনাকে বুঝাইব ? আমার উপায় কি হইবে ? শেষে কি জাতি কুল সব যাইবে ? কতদিন নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদিয়াছি। আমাকে রক্ষা করিবার আর ত লোক দেখি না। আপনার কথা এই বিপদের সময়ে সর্ব্বদা মনে হয়। আপনি চেষ্টা করিলে আমাকে রক্ষা করিতে পারেন। এদের যে প্রকার বাড়াবাড়ি দেখিতেছি, তাহাতে কোন্ দিন আমার সর্ব্বনাশ হইবে। এক একবার মনে করি, বাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন করি। কিন্তু কোথায় যাইব ? কে আমাকে আশ্রয় দিবে ? বাহিরে যে আরও বিপদ্ হইবে না, তাহাই বা কে বলিল ? তবে কি আত্মহত্যা করিব ? তাই বুঝি অদৃষ্টে আছে।

আপনার কথা সর্ব্বদা মনে হয়, তাই আপনাকে এই পত্র লিখিলাম। আপনি কি আমাকে বাঁচাইতে পারেন না ? আপনাদের বাড়ীতে ত দশটা দাসী আছে, আমাকেও তেমনি একটা দাসী করিয়া রাখিলে কি কোন দোষ হইবে ?

একদিন ভয় ত্যাগ করিয়া দাদাকে বলিয়াছিলাম, আমাকে কাশী পাঠাইয়া দেন। দাদা ত একেবারে রাগিয়া আগুন হইলেন। বৌদিদি সে কথা শুনিয়া যাহা বলিলেন, তাহা পত্রে লেখা যায় না। আমার চরিত্রের দোষ দিলেন; আমি খারাপ মতলবে কাশী যাইতে চাহিতেছি, তাহা পর্য্যন্তও বলিলেন। আরও কত কি বলিলেন। সেই দিনই গলায় দড়ি দিয়া মরিতাম; কিন্তু কি জানি কেন পারিলাম না!

আমার মত দুঃখিনীর জন্য যদি আপনার মনে দয়া হয়, তবে আমার

একটা পথ করিবেন। আমার পৃথিবীতে কেহই নাই। কত কথা বলিতে চাহিয়াছিলাম; কিছুই বলিতে পারিলাম না।

আপনারা সকলে কেমন আছেন?

আপনার হতভাগিনী

সুপ্রভা।”

পত্র পড়িয়া আমার যে মনের অবস্থা কি হইল, তাহা বলিতে পারি না। সুপ্রভা যে বিধবা হইয়াছে, তাহা আমি জানিতাম না; অনুকূল যে লেখা-পড়া করিয়া এরূপ একটা জানোয়ার হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও আমি জানিতাম না। এখন উপায়?—কাহার নিকট পরামর্শ লইব? সুপ্রভাকে পত্র লিখিতেও সাহস হইল না; কি জানি, অনুকূল কি তাহার স্ত্রীর হাতে যদি পত্রখানি পড়ে, তবে সুপ্রভার যন্ত্রণার ত সীমা থাকিবে না। একবার মনে করিলাম, দাদার কাছে গয়ায় যাই; সেখানে দাদার পরামর্শ লইয়া যাহা হয় করিব; কিন্তু আবার মনে হইল, দাদা কি করিবেন? সুপ্রভা পরের মেয়ে, পরের বৌ; আমাদের তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিবার বা করিবার কি অধিকার আছে? সাত পাঁচ ভাবিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম। সমস্ত রাত্রি সুপ্রভার কথাই ভাবিলাম। শেষে ভাল হউক, মন্দ হউক, একটা কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলাম।

পরদিন প্রভাতের গাড়ীতেই আমি পাটনা রওনা হইলাম। সেখানে পৌঁছিয়া অনুকূলের বাড়ীতে না গিয়া একটা হোটেলে গিয়া উঠিলাম। অনেক দিন পাটনায় ছিলাম, ইচ্ছা করিলে দুই একজন পরিচিতের বাড়ীতে যাইতে পারিতাম; কিন্তু আমি যে পাটনায় গিয়াছি, সে সংবাদ কেহ জানিতে না পারে, ইহাই আমার ইচ্ছা।

সন্ধ্যা গাঢ় হইলে আমি অনুকূলের বাড়ীর দিকে চলিলাম। পূর্ব্বেই

সুপ্রভাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম, সেই পত্রখানি সঙ্গে লইয়া গেলাম ; অভিপ্রায়, কোন সুযোগে তাহার হাতে পত্রখানি পৌছাইয়া দেওয়া। প্রথমে কোন উপায়ই দেখিলাম না ; অনেকক্ষণ এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। অনুকূলদের বাড়ীর পার্শ্বেই একখানি ভুনার দোকান ছিল, এখনও দোকানখানি সেইখানেই আছে। দোকান-দারের একটি ছোট মেয়ে একটা কলসী লইয়া জল আনিতে আসিয়াছিল। আমি তাহাকে ডাকিলাম এবং ও-বাড়ীর দিদিকে চেনে কি না, জিজ্ঞাসা করিলাম। মেয়েটি বলিল, সে সর্ব্বদাই ও-বাড়ীতে যায় ; তাঁরা সকলেই তাকে ভালবাসেন। আমি তখন সুপ্রভার পত্রখানি তাহার হাতে দিয়া চুপে চুপে তাহাকে দিবার জন্য বলিয়া দিলাম। অনেক ভাবিয়াছি, কাজটা কতদূর সঙ্গত হইল তাহা নূতন করিয়া ভাবিবার আর সময় ছিল না। মানুষ যখন কোন কাজ করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হয়, তখন কর্ত্তব্যবিচার তাহার মাথায় আসে না। আমি একটা গাছতলায় দাঁড়াইয়া রহিলাম, মেয়েটি চলিয়া গেল।

পত্রে লিখিয়াছিলাম, আমি সেই রাত্রেই কোন একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রস্তুত হইয়া থাকিব ; সুপ্রভা যেন সেখানে উপস্থিত হয় ; তাহাকে কাশীতে রাখিয়া আসিব।

শাস্ত্রে কি বলে, জানি না, ধর্ম্মের কাছে আটক পড়িব কি না, তাহাও ভাবি নাই। আমার মনে হইয়াছিল, সুপ্রভাকে বাড়ীছাড়া করিতে না পারিলে সে প্রাণত্যাগ করিবে। সে চিন্তাও আমার পক্ষে অসহ্য। তাই কোন কথা না ভাবিয়া আমি সুপ্রভাকে ঘরের বাহির করিতে গিয়াছিলাম। সমাজ-হিতৈষিগণ নিশ্চয়ই আমার এ অপরাধ মার্জ্জনা করিতে প্রস্তুত হইবেন না।

মেয়েটিকে অনুকূলের বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই আমি চলিয়া আসিলাম। যে সরাইতে ছিলাম, সেখানে আসিয়া আহারাদি শেষ করিলাম। তাহার পর যথাসময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলাম। কিছুক্ষণ পরেই সুপ্রভা আসিল। সে এক-বস্ত্রে আসিয়াছিল; সঙ্গে একটি পয়সাও আনে নাই; সামান্য গামছাখানিও তাঁহার সঙ্গে ছিল না।

আমাকে দেখিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল। আমি বলিলাম, "ভয় কি? এই রাত্রের গাড়ীতেই তোমাকে লইয়া কাশী যাইব। সেখানে মা আছেন, তুমি তাঁর মেয়ের মত সেখানে থাকিবে। আমি যতদিন বাঁচিব, তোমার ভার আমার উপর রহিল।"

আর কথা বলিবার সময় ছিল না, বোধ করি, আবশ্যকও ছিল না। তাড়াতাড়ি একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া ষ্টেসনে আসিলাম; সেখান হইতে টিকিট কিনিয়া পরদিন কাশীতে মায়ের কাছে পৌছিলাম। মা আমার সঙ্গে একটি যুবতী দেখিয়া প্রথমতঃ অবাক্ হইয়া গেলেন; তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি সুপ্রভাকে চিনিতে পারিলেন। সমস্ত কথা শুনিয়া মা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, তাঁহার চক্ষে মুক্তাবিন্দু ফুটিয়া উঠিল। সুপ্রভা সেই দিনই তাহার সেই আগুল্‌ফ-লম্বিত তৈলসংস্পর্শহীন সুন্দর কেশরাশি মুণ্ডন করিয়া ফেলিল; মায়ের সহস্র নিষেধ না মানিয়া শ্বেতবস্ত্র ত্যাগ করিল, গৈরিক ধারণ করিল। তাহার সেই গৈরিক-বসনের মধ্য দিয়া অপরূপ লাবণ্য ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। আমার মনে হইল, পৃথিবীতে বুঝি দেবীর আগমন হইল। মানবী সুপ্রভা ব্রহ্মচারিণী বেশে দেবতায় রূপপ্রভায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অনুকূল পরদিন ভগিনীকে না দেখিয়া কি করিয়াছিল, সে সংবাদ

আমি লই নই। তাহার যাহা ভাবিবার, সে ভাবুক! আমি সুপ্রভাকে যে হিন্দু বিধবার প্রকৃত পথে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিলাম, তাহাতেই আমার আনন্দ। দুই তিন দিন কাশীতে থাকিয়া শেষে মায়ের পদধূলি লইয়া গয়াতে দাদার কাছে আসিলাম, আসিবার সময় মাকে এ কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া আসিয়াছিলাম; তিনি এ সংবাদ দাদাকেও দেন নাই, আমিও দাদাকে কোন কথা বলি নাই।

তার পর অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে। সেই পবিত্র-চরিত্রা, সংযত-হৃদয়া, সরলা, ব্রহ্মচারিণী সুপ্রভার জীবনের ইতিহাস কি ভুলিয়া গিয়াছি? ভগবান্, কোন দিন তাহা ভুলিতে পারিব না। বর্ষার ঘনঘটায় গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইলে, যখন আমি বাতায়নপথে মেঘমণ্ডিত আকাশের দিকে চাহিয়া থাকি,—তখন ছাত্র-জীবনের একটী সমুজ্জ্বল স্মৃতি আমার ব্যথিত হৃদয়ের শিরা-উপশিরাগুলির মধ্যে একটা তীব্র বেদনা সঞ্চারিত করে, মনে হয় সুপ্রভার অদৃষ্টাকাশও এমনি অন্ধকারসমাচ্ছন্ন, তাহাতে একটি মাত্রও আশার আলোক নাই। একটা উচ্ছ্বসিত দীর্ঘনিশ্বাসকে বুকের মধ্যে চাপিয়া অতি কষ্টে বলিয়া উঠি—"হে ভগবান!"

সমাপ্ত।

ছোট কাকী

জলধর বাবুর ছোটকাকী কয়েকটী গল্পের সমষ্টি। ছোটকাকী তাহার প্রথম গল্প। এক ছোটকাকী গল্পটী পড়িলেই পুস্তক-ক্রয় সার্থক বলিয়া মনে হইবে। এই সংগ্রহের গল্পগুলি পড়িলে চক্ষু ফাটিয়া জল আসে, হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়ে, আর গ্রন্থকারকে সহস্রমুখে প্রশংসা করিতে হয়। সুন্দর বাঁধাই পুস্তকের মূল্য বার আনা মাত্র।

নূতন গিন্নী

বহু পুরাতন হইলেও গিন্নী চিরদিনই নূতন। কিন্তু তাহা ভাবিয়া এ পুস্তকের নামকরণ হয় নাই। নূতন গিন্নীর ইতিহাস সকলেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য। আজকাল দেশের যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে এই পুস্তকখানি কর্ত্তা, গিন্নী, বৌ, এমন কি সকলেরই পড়া কর্ত্তব্য। মূল্য দশ আনা মাত্র।

দুঃখিনী

একটী বালবিধবার সুন্দর চিত্র। এই পুস্তকখানি জলধর বাবু ১৫ বৎসর বয়সের সময় লিখিয়াছিলেন; এখন পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে তিনি বলেন, তাঁহার হাত দিয়া বাল-বিধবার এমন সুন্দর কাহিনী আর বাহির হইতে পারে না। ঘরে ঘরে দিন-পঞ্জিকার মত এই পুস্তকখানি পঠিত হওয়া কর্ত্তব্য। মূল্য বার আনা মাত্র।

আমার বর

অলৌকিক—কিন্তু অস্বাভাবিক নহে।

বাঙ্গালা-সাহিত্যে শ্রীযুক্ত জলধর সেনের পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। তিনি আপনার শক্তি ও সামর্থ্য লইয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। তিনি বহু গল্প-পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন এবং সুধী-সমাজে তাহা সমাদৃত হইয়াছে। তাঁহার এই নূতন গল্প-পুস্তক "আমার বর" ভাষার ললিত-বিন্যাসে, বর্ণনার চারু-চিত্রে, গল্প বলিবার মোহিনী ভঙ্গিতে এই শ্রেণীর অপর গ্রন্থ সমূহকে অতি-ক্রম করিয়াছে, ইহা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি। জলধর বাবুর গ্রন্থে উচ্ছৃঙ্খলতা নাই, কপটতা নাই, রসবিকার নাই। এই পুস্তক কেন, জলধর বাবুর যে কোন পুস্তক নিঃসঙ্কোচে মা, স্ত্রী, ভগিনী ও কন্যার হস্তে দেওয়া যাইতে পারে; বাঙ্গালা-সাহিত্যে এই উচ্ছৃঙ্খলতার দিনে ইহা বড় কম প্রশংসার কথা নহে। জলধর বাবুর গ্রন্থের ন্যায় সুরুচিসম্পন্ন, সারবান্ ও স্বাস্থ্যবান্ গ্রন্থ বাঙ্গালা-সাহিত্যে বিরল, ইহা অবিসংবাদিত সত্য। এই "আমার বর" পুস্তকখানি সংবাদপত্রে ও সুধী-পাঠকগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে প্রশংসিত। বইখানি প্যারাগণ প্রেসে মুদ্রিত, সুতরাং ছাপা সুন্দর। যেমন উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ছাপা, তেমনই বহুমূল্য রেশমী কাপড়ে বাঁধাই; তাহার পর আবার দুই খানি উৎকৃষ্ট চিত্রে এই পুস্তক সুশোভিত; অথচ ইহার মূল্য এই সকলের তুলনায় সামান্য—পাঁচসিকা মাত্র, ডাকমাশুল তিন আনা।

করিম সেখ

বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন ধরনের উপন্যাস।

শ্রীযুক্ত জলধর বাবু এতদিন হিন্দু গৃহস্থঘরের কাহিনীই ছোটগল্পে ও উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করিয়া আসিয়াছেন। দরিদ্র, অনাদৃত, উপেক্ষিত, নিরক্ষর মুসলমান কৃষক-জীবনের সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, গৃহ পরিবারের কথা এত দিন তিনিও লিপিবদ্ধ করেন নাই, অপর কেহও সে চেষ্টা করেন নাই। জলধর বাবুই এ কার্য্যে এই নূতন ব্রতী হইলেন। তিনি আবাল্য গ্রামবাসী, তিনি দরিদ্রের গৃহস্থালীর কথা, তাহাদের ঘরের কথা সমস্তই জানেন। তাহার পর করুণ-কাহিনী লিখিতে বাঙ্গালা লেখকগণের মধ্যে তিনি অদ্বিতীয়, একথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। সেই জলধর বাবুর লেখনী-প্রসূত "করিম সেখ" যে পরম উপাদেয় পুস্তক হইয়াছে, সে বিষয়ে মতভেদ নাই। ইহাতে তিনি একটী অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন; তাহা যেমন অভাবনীয় তেমনই সুন্দর। করিম সেখ যে গল্প সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিবে, সে বিষয়ে আমাদের অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। এণ্টিক কাগজে সুন্দর ছাপা মনোহর বাঁধাই একখানি ছবি সম্বলিত—অথচ মূল্য অতি কম—বার আনা মাত্র।

---*---

কাঙ্গাল হরিনাথ

(প্রথম খণ্ড)

দশখানি আলোক-চিত্র সম্বলিত।

যাঁহার বিজয়-বসন্ত পাঠ করিয়া ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী পাঠক অবিরল অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন, যাঁহার ফিকিরচাঁদের বাউল-সঙ্গীতে এক সময় বাঙ্গালা দেশ প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল, যাঁহার ব্রহ্মাণ্ডবেদ আত্ম ও সাধনতত্ত্বের অমূল্য রত্নভাণ্ডার, যিনি প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা নামক সংবাদপত্র প্রকাশিত করিয়া অকুতোভয়ে পল্লীবাসীর সুখদুঃখ, অভাব অভিযোগ, জমিদার ও কর্ম্মচারীদিগের অন্যায়াচরণ প্রভৃতির কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন, নীল-বিদ্রোহের সময় যিনি নদীয়া জেলার বিদ্রোহের সংবাদ যথারীতি 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত করিতেন, শেষ জীবনে যিনি সাধনপথে অগ্রসর হইয়া সর্ব্বদা প্রেমানন্দে মগ্ন থাকিতেন, সেই কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর, সাধকপ্রবর কাঙ্গাল হরিনাথের জীবনকথা তাঁহার প্রিয় ছাত্র, ভক্ত শিষ্য জলধর বাবু প্রকাশিত করিয়াছেন। এই খণ্ডে কাঙ্গালের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা এবং তাঁহার বাউল-সঙ্গীত ও অন্যান্য গানের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে এবং অনেক অপূর্ব্ব-প্রকাশিত গানও এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মানসী পত্রিকায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক তথ্য ও নূতন গান ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক কাঙ্গাল হরিনাথ পাঠ করিয়া বলিয়াছেন যে "জলধর বাবু হিমালয় লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, কাঙ্গাল হরিনাথ লিখিয়া পবিত্র হইয়াছেন।" এই জীবন-চরিতখানি সম্পূর্ণ নূতন ধরণে লিখিত; এমন ভাবে জীবনচরিত কেহ কখন লেখেন নাই। এই পুস্তকে নিম্নলিখিত কয়েকখানি আলোক-

চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে ;—(১) কাঙ্গাল হরিনাথ, (২) সাধকপ্রবর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, (৩) শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর, (৪) ৺ মথুরানাথ মৈত্রেয় (শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের পিতৃদেব) (৫) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, (৬) কাঙ্গাল হরিনাথের সহধর্ম্মিণী, (৭) কাঙ্গালের কুটীর, (৮) কাঙ্গালের স্মৃতিসভা, (৯) কাঙ্গালের হস্তলিপি, (১০) শ্রীযুক্ত জলধর সেন। পুস্তকখানি বৃহদায়তন হইয়াছে ; ইহা উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দররূপে ছাপা হইয়াছে ; বাঁধাইও মনোরম। এমন কাগজ, এরূপ ছাপা, এমন বাঁধাই, এত ছবি, কিন্তু জলধর বাবু কাঙ্গালের জীবন-কথার বহুল প্রচার মানসে ইহার মূল্য মাত্র পাঁচ সিকা করিয়াছেন।

কাঙ্গাল হরিনাথ.

দ্বিতীয় খণ্ড।

(ব্রহ্মাণ্ডবেদের পরিচয়।)

কাঙ্গাল হরিনাথের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর অনেকেই দ্বিতীয় খণ্ড দেখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। 'মানসী' পত্রে প্রতি মাসে কাঙ্গাল হরিনাথের 'ব্রহ্মাণ্ডবেদ' সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে, তাহারই কতকগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া এবং অনেক নূতন বিষয় সংযোজিত করিয়া এই দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহাতে লেখক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় কাঙ্গালের 'ব্রহ্মাণ্ডবেদের' বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কাঙ্গাল যে সাধন-পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, কাঙ্গালের জ্ঞানভাণ্ডার যে কত অমূল্য রত্নে পরিপূর্ণ ছিল, জলধর বাবু অতি সহজ ও সরল ভাষায় তাহার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যিনি কাঙ্গাল হরিনাথের প্রথম খণ্ড পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাকে এই দ্বিতীয় খণ্ড পাঠ করিতেই হইবে। ছাপা কাগজ ও বাঁধাই অতি উৎকৃষ্ট ; মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র।

---

৯ ইহার কাগজ, ছাপা, সাজান, মানান, অতি পরিপাটী—ইহার প্রবন্ধগুলি একমাসব্যাপী অবকাশরঞ্জনোপযোগী।

১০ ইহার মূল্য শুনিলেই বেশী মনে হয়, কিন্তু বিষয়, আকার, ছবি প্রভৃতি খতাইয়া তুলনা করিলে, অপর সকল মাসিক অপেক্ষা ইহা যে নিতান্তই অল্পমূল্য, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

১১ ইহার আকার ডবলক্রাউন্ ৮ পেজী ২০।২৫ ফর্ম্মা অর্থাৎ প্রতি সংখ্যায় অন্যূন ১৬০ হইতে ২০০ পৃষ্ঠা থাকে।

১২ ইহা প্রতিমাসের প্রথম দিনই নির্দ্দিষ্টরূপে প্রকাশিত হয়।

১৩ ইহার প্রকাশব্যয় প্রতিমাসে ন্যূনাধিক দুইসহস্র মুদ্রা।

১৪ ইহার প্রতিসংখ্যায় আপনার পড়িবে মাত্র ॥০ আনা, ভিঃ পিঃতে ॥৵০ আনা। যে কোনও একসংখ্যা নমুনাস্বরূপ লইয়া মিলাইয়া দেখুন, উপরিলিখিত প্রত্যেক কথা বর্ণে বর্ণে সত্য কি না।—কিমধিকমিতি—